যে জীবন ফড়িঙের যে জীবন জোনাকির

সাজিদ ইসলাম

যে জীবন ফড়িঙের
যে জীবন জোনাকির

সাজিদ ইসলাম

BOOKMARK
PUBLICATION

আল্লাহ্ যদি অনুগ্রহ্ করে আমাকে জান্নাত দেন, তবে জান্নাতে গিয়ে ইনশাআল্লাহ্ একটা চায়ের দোকান দেব। সবুজ বাগান, ঝর্ণাধারা, শীতল বাতাস—এর মধ্যে ছোট্ট একটা টং দোকান। আর সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর (রা.) আর উমর (রা.) এর সাথে চা খেতে খেতে গল্প করব।

সূচি

ভূমিকা/ ১১

লেখক কথন/ ১৩

সোহবতের গল্প/ ১৫

সুখে থাকা মানে অনেক কিছু থাকা নয়। সুখে থাকে মানে, সুখে থাকা।/ ১৯

আবরার ফাহাদ এবং সূরাহ বুরুজের সেই বালক ও রাজার গল্প/২২

কিচ্ছু ভালো লাগে না/ ২৪

চক্র/ ২৭

যে জীবন ফড়িঙের, যে জীবন জোনাকির, সে জীবন যেন আমার না হয়/ ৩১

গোপন পাপ/ ৩৬

ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড/ ৪০

জান্নাতে কোনোদিন আমাদের মন খারাপ হবে না/ ৪৩

তুমি অবিচল থেকো/ ৪৬

তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম/ ৫০

জীবন থেমে থাকে না, পাল্টে যায়/ ৫৪

লকডাউন/ ৫৮

এক টুকরো গরুর মাংস/ ৬৬

স্পিরিচুয়াল মার্ডার/ ৬৮

একুশ শতকের গুরাবা/ ৭২

আহারে জীবন, আহারে/ ৭৬

আল্লাহ যেন আমল দিয়ে আমাদেরকে আর দশজন থেকে আলাদা করে দেন/ ৭৯

ভয়/ ৮১

নিঃস্বার্থ ভালোবাসা/ ৮৪

মানুষ কতই না অকৃতজ্ঞ!/ ৮৬

জীবনের ষোল আনাই মিছে/ ৮৯

দুটি দুআ/ ৯২

কিশোর(!) অপরাধ/ ৯৪

জীবন থেকে শেখা/৯৬

যখন আপনি কাউকে খুব মিস করেন/ ৯৭

ব্যথার কথা/ ৯৯

চলতি পথে/ ১০০

আর রাহমানের দরবারে/ ১০১

সেকেলে বাবা-মা, কিচ্ছু বোঝে না!/ ১০৪

আত্মসম্মানের মরীচিকা/ ১০৬

ছেলে নাকি মেয়ে?/ ১০৯

সব তরকারির আলু/ ১১২

এক ঠোঙা ঝালমুড়ি এবং অতঃপর/ ১১৪

হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল/ ১১৬

আমাদের চেষ্টা, সংগ্রাম, প্রায়োরিটি/ ১১৮

সূরাহ যিলযাল থেকে/ ১২০

ইনসাফের এপিঠ-ওপিঠ/ ১২২

এক পিতার দীর্ঘশ্বাস/ ১২৬

একটি বিশুদ্ধ অন্তরের প্রার্থনায়/ ১২৮

স্বাধীনতা *"মানুষ কী বলবে"* নামের ঐ কারাগার থেকে মুক্তিতেই/১৩১

একটি লাভজনক ব্যবসা/ ১৩৩

আর এটাই মহাসাফল্য/ ১৩৬

প্রচণ্ড এক উত্তাপের দিনে/ ১৪০

সালাত/ ১৪৩

বুঝলিনা জীবন কারে কয়/ ১৪৫

'তাঁর ইহসানগুলো আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়!'/ ১৫২

আগে হালাল ইনকাম পরে হালাল খাবার/ ১৫৭

শেষ কবে আপনি প্রিয় নবির জন্য কেঁদেছেন?/ ১৫৮

গৌরবময় ইতিহাসের পাঠ/ ১৬০

আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়া/ ১৬৩

সত্যিকারের মৃত্যুর আগে এরা প্রতিদিন অনেকবার করে মরে!/১৬৬

উপহাসের অট্টহাসি/ ১৬৭

তিন বন্ধুর মৃত্যুভাবনা/ ১৬৯

কৃতজ্ঞতা STARTS FROM HERE/ ১৭১

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

আমরা এমন একটা সময়ে বেঁচে আছি যখন জীবনকে মাপা হয় বস্তুর মানদণ্ডে। পরিচয় মাপা হয় উপার্জন দিয়ে। জীবনের সাফল্য হিসেব হয় পণ্য, ভোগ, সম্পদ আর সস্তা সুখের প্যারামিটারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ডিগ্রি পাওয়া, কাজের উদ্দেশ্য ভোগ করা। কী করো—মানে তুমি কত কামাই করো। কেমন চলছে—মানে তোমার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এখন কেমন। নৈতিকতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হলো—'মানুষ কী বলবে', 'সমাজের আর দশজন কী করছে'।

ছোটবেলা থেকে এভাবেই আমরা জীবনকে দেখতে শিখি, মাপতে শিখি, স্বপ্ন দেখি। এভাবেই আমরা সাফল্য খুঁজি। চাকার ভেতরে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো ক্রমাগত ছুটে চলি। কিন্তু এই ছোটা আমাদেরকে গন্তব্যের কাছে নিয়ে যায় না। প্রতিটি দিন শুরু করি ঠিক যেন আগের জায়গা থেকে।

চক্র চলতে থাকে।

চারপাশে নিরন্তর গতিশীলতা, কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই। নির্বাসিত, পরাজিত, বিস্মৃত, পরিত্যক্ত হবার আশঙ্কা আমাদের থামতে দেয় না। যেন কোনো অসুস্থ প্রতিযোগিতা, কোনো মহাজাগতিক যিরো-সাম গেইমে আটকে গেছি আমরা। স্বাধীনতার মোড়কে কিনেছি দাসত্ব।

মানুষ ছুটতে শুরু করে সকালে। তারপর অবসন্ন চোখে যান্ত্রিক জঙ্গল পেরিয়ে ফিরে আসে সূর্য ডোবার সময়, দলবেঁধে। ধীর, অনুগত পদক্ষেপে গিয়ে ঢোকে অতিকায় অট্টালিকার পরস্পরবিচ্ছিন খোপে। ভাঙতে থাকা সমাজ, পরিবার আর মানুষের কথা ভুলে, পচনের গন্ধ বুকে নিয়ে সন্ধ্যা-রাতগুলো কাটিয়ে দেয় নিজস্ব

নেশায়। কেউ গা ভাসায় রাতের জীবনের আদিম উল্লাসে, কেউ স্থির চোখে চেয়ে থাকে বোকা বাক্সের দিকে।

চক্র চলতে থাকে। বিরাজ করে এক অসুস্থ, অস্থির স্থিতিশীলতা।

অসুস্থ চক্রের মধ্যে আটকাপড়া এই আমাদের সময় হয় না জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আর সফলতার অর্থ নিয়ে ভাবার। সুযোগ হয় না মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তাঁর মুখোমুখি হবার মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার। ঈমান জীর্ণ হতে থাকে, কিন্তু ছকবাঁধা, অভ্যস্ততার ধর্মপালনের বাইরে আর কিছু ভাবার ফুরসত মেলে না।

এভাবে সময় ফুরিয়ে আসে কিন্তু ছোটা বন্ধ হয় না। মূল গন্তব্যকে ভুলিয়ে দিয়ে এই অদ্ভূত জীবন মুসাফিরকে মশগুল করে রাখে অর্থহীন খুঁটিনাটিতে।

শুধু লেখা দিয়ে এই চক্রের ঘোর কাটানো সহজ না, হয়তো সম্ভবও না। কিন্তু এ বইয়ের লেখাগুলো আর কিছু না হোক, একবার হলেও আপনাকে দুনিয়ার ওপারের জীবনটাকে নিয়ে ভাবাবে। আপনার রবকে নিয়ে ভাবাবে। একটু মনোযোগ দিলে হয়তো নতুন এক জীবনের স্বপ্ন দেখতেও শেখাবে। ভাবাবে চক্র ভাঙার কথা। আমাকে ভাবিয়েছে। লেখাগুলো নিয়ে আরও অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু বইটা পড়ার কারণ হিসেবে সম্ভবত এটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ে ঈমান জীর্ণ হয়; যেমন জীর্ণ হয় পুরনো কাপড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর, যাতে তিনি তোমাদের হৃদয়ে তোমাদের ঈমান নবায়ন করে দেন।" (তরজমা, তাবারানি, হাকেম: ৫, সহীহুল জামে':১৫৯০)

আল্লাহ্‌ আযযা ওয়া যাল আমাদের জীর্ণ ঈমানকে নবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আসিফ আদনান
জুমাদিউস সানি, ১৪৪২
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

লেখক কথন

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

এই বইটা আসলে 'বই' হিসেবে লেখা হয়নি। এখানে যে লেখাগুলো আছে—আমি কোনোদিন ভাবিনি এগুলো একদিন বই হিসেবে প্রকাশিত হবে। এখানে প্রতিটি লেখার পেছনে কোনো না কোনো ঘটনা আছে, পটভূমি আছে, চলমান কোনো ইস্যু আছে। যখন লিখতাম, মনের আনন্দে লিখতাম, নিজের জন্য লিখতাম। এই বইয়ের কাজ করতে গিয়ে সেই আনন্দের দিনগুলো ফিরে ফিরে এসেছে। অনেক স্মৃতি, নস্টালজিয়া, আবেগ বারবার ছুঁয়ে গেছে। আমি খুব করে চাইব যারা এই বইটা পড়বেন, তারা সেই স্মৃতি, আবেগগুলো পুরনো দিনের ছবির এ্যালবাম উল্টানোর মতো সযত্নে পড়বেন।

ছোটবেলা থেকে আজ অবধি অনেক লেখকের বই পড়ে আমার লেখক হতে ইচ্ছে হয়েছে। লেখক বলতে যা বোঝায়, নিজেকে আমার কখনোই সেটা মনে হয়নি। তবুও নিজের নামে যখন একটা বই ছেপে হাতে আসবে—আমি অবশ্যই সেই লেখকদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

বইটা কাদের জন্য লেখা? এই প্রশ্নটা আমি নিজেকে করেছিলাম। এর কোনো নির্দিষ্ট উত্তর নেই। এখানে আমার নানান বয়সের নানা অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি স্থান পেয়েছে। নিজের জীবন থেকে, চারপাশের মানুষের জীবন থেকে আমি যা শিখেছি, সেই কথাগুলোই বলার চেষ্টা করেছি। আপনি যখন বইটা হাতে নেবেন, পড়তে পড়তে যদি মনে হয়, এগুলো আপনারই কথা, আপনার মনের কথা যেগুলো আপনিও বলতে চাইতেন—তবে বইটা আপনার জন্যই লেখা।

বইটির পেছনে আমার সময়, শ্রম সবকিছু সার্থক হবে, যদি এই লেখাগুলো কারও জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। যদি কারও চিন্তার জগতে দাগ কাটতে পারে। যদি জীবন নিয়ে নীরবে, নিভৃতে কাউকে ভাবতে বাধ্য করে।

আর আমার রব যদি দয়া করে এই কাজটাকে কবুল করেন, তবে সেটাই হবে এই বই থেকে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

সাজিদ ইসলাম
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সোহবতের গল্প

ল্যাপটপ কাজ করছিল না। প্রথমে ভাবলাম ব্যাটারির সমস্যা, নতুন ব্যাটারি কিনলাম কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। আবার গেলাম ঐ দোকানে, সমস্যা নাকি চার্জারে, নতুন একটা চার্জারও কিনলাম। সঙ্গে এক ছোট ভাই ছিল। আপাতদৃষ্টিতে ছোট একটা সমস্যায় একসাথে এতগুলো টাকা চলে গেল বলে তাকে আফসোস করেই বললাম—হুদাই টাকাগুলো গচ্চা গেল। ছোটভাই জবাব দিল, ভাই এভাবেই তো আল্লাহ একজনকে দিয়ে আরেকজনের রিযিকের ব্যবস্থা করেন!

সময়ের এক্সিসে মাপলে কথাটা বলতে কয়েক সেকেন্ড লেগেছে কিন্তু মুহূর্তেই চিন্তার জগতটা ১৮০ ডিগ্রি কোণে ঘুরে গেল। আরে তাই তো? এভাবেই তো এই দোকানির রিযিকের ব্যবস্থা হয়, ঠিক সেভাবে আমাদের সবার রিযিকের পেছনেও আল্লাহ কাউকে না কাউকে উছিলা বানিয়ে দেন। হঠাৎ আরও একটা উপলব্ধি হলো—**উত্তম সোহবত!**

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো" (সূরাহ আত তাওবা, ৯:১১৯)

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

"আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" (সূরাহ মায়েদা, ৫:৫৬)

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

> "তারা কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না। বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়।" (সূরাহ আয যুখরুফ, ৪৩:৬৬-৬৭)

কেমন সঙ্গী আপনি বেছে নিচ্ছেন কিংবা কাদের সোহবতে সময় কাটাচ্ছেন এটাই মূলত আপনার জীবনের পরিণতি নির্ধারণ করে দেবে। এমনকি মৃত্যুশয্যায়ও এই বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারটা ভূমিকা রাখবে। মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষ মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে গেলে তার সামনে পেশ করা হয় বন্ধুবান্ধবদের। মরাণাপন্ন ব্যক্তি আড্ডাবাজ ও বিলাসপ্রিয় হলে তার সাথীগুলো হয় বদকার। আর সে ভালো মানুষ হলে সঙ্গীগুলো হয় নেককার। মুফতি শফি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এজন্যই মানুষের উচিত উদাস ও আমুদে লোকদের সঙ্গ থেকে দূরে অবস্থান করা।[১]

অথচ আজ আমাদের ভালো বন্ধু কারা? যারা খুব লোক হাসাতে পারে, যারা কথায় কথায় কৌতুক করতে পারে, যারা ফেসবুকে খুব মজা করতে পারে, যারা সারাদিন আমাদেরকে অর্থহীন কাজে ব্যস্ত রাখতে পারে। এরাই আমাদের পছন্দের ব্যক্তি, আর আল্লাহও এদের সাথেই আমাদের হাশরের ব্যবস্থা করে দেবেন।

আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি এক সম্প্রদায়কে ভালোবাসে তাহলে সে তাদের সাথে কেন অবস্থান করবে না? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "ব্যক্তি তার সাথে থাকবে যাকে সে ভালবাসে।"[২] অন্য এক বর্ণনায় আছে, বান্দা দুনিয়াতে যাকে ভালোবাসে তার হাশরও তার সাথেই হবে।

শাইখ আব্দুর রহমান আরিফী হাফিযাহুল্লাহ একবার ওনার এক লেকচারে একটা ঘটনা বলেছিলেন,

> "হাসান আল বাসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে ভালো মানুষদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে তৎপর হও, কারণ এই সম্পর্কের কারণে হয়তো তোমরা আখিরাতে উপকৃত হতে পারবে।
>
> তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো কীভাবে?

---

[১] মৃত্যুশয্যায় শয়তানের ধোঁকা, মুফতি শফি রহিমাহুল্লাহ

[২] বুখারি: ৬১৭০, মুসলিম: ২৬৪১

তিনি বললেন যখন জান্নাতিরা জান্নাতে অধিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন তারা পৃথিবীর ঘটনা স্মরণ করবে এবং তাদের পৃথিবীর বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যাবে। তারা বলবে, আমি তো আমার সেই বন্ধুকে জান্নাতে দেখছি না, কী করেছিল সে?

তখন বলা হবে, সে তো জাহান্নামে।

তখন সেই মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বলবেন, হে আল্লাহ, আমার বন্ধুকে ছাড়া আমার কাছে জান্নাতের আনন্দ পরিপূর্ণ হচ্ছে না।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদেশ করবেন অমুক ব্যাক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাতে। (অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমানও আছে এমন ব্যক্তিদের)

তার বন্ধু জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেল এই কারণে নয় যে সে তাহাজ্জুদ পড়ত, বা কুরআন পড়ত বা সাদাকা করত বা রোযা রাখত, বরং সে মুক্তি পেল কেবলই এই কারণে যে তার বন্ধু তার কথা স্মরণ করেছে। তার জান্নাতি বন্ধুর সম্মানের খাতিরে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হলো।

জাহান্নামিরা তখন অত্যন্ত অবাক হয়ে জানতে চাইবে কী কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হলো, তার বাবা কি শহিদ? তার ভাই কি শহিদ? তার জন্য কি কোনো ফেরেশতা বা নবি শাফায়াত করেছেন?

বলা হবে না, বরং তার বন্ধু জান্নাতে তার জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ করেছে।

এই কথা শুনে জাহান্নামিরা আফসোস করে বলবে হায় আজ আমাদের জন্য কোনো শাফায়াতকারি নেই এবং আমাদের কোনো সত্যিকারের বন্ধু নেই, যার উল্লেখ আছে এই আয়াতগুলোতে,

"অতএব আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। এবং কোনো সহৃদয় বন্ধু ও নেই।" (সূরাহ আশা-শুআরা, ২৬: ১০০-১০১)"[৩]

ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি জান্নাতে গিয়ে আমাকে দেখতে না পাও তবে আমার খোঁজ করো আর আমাদের রবকে বলো, ও আল্লাহ! তোমার অমুক

---

[৩] তাফসীরে বাগাভী

বান্দা দুনিয়াতে আমাদেরকে তোমার পথে দাওয়াত দিত, তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। কথাগুলো বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। রহিমাহুল্লাহ।[৪]

উত্তম সাথী কে? যাকে দেখে জান্নাতের কথা মনে পড়ে। যার সাথে কিছুক্ষণ থাকলে খুব ভালো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। যার আমল দেখলে খুব ঈর্ষা হয়। তার মতো আমল করতে ইচ্ছে হয়। যার সাথে জান্নাতে একসাথে থাকতে ইচ্ছে হয়। যার উদাহরণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন আতর বিক্রেতার সাথে। সে আশেপাশে থাকলেও লাভ, অন্তত সুগন্ধ পাওয়া যায়।

আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "সৎ ও অসৎ বন্ধুর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কামারের ন্যায়। আতর বিক্রেতা হয়তো তোমাকে একটু আতর লাগিয়ে দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে আতর ক্রয় করবে, অথবা তুমি তার কাছে আতরের ঘ্রাণ পাবে। আর কামার হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে নয়তো তার কাছ থেকে খারাপ গন্ধ পাবে।"[৫]

শুধু তাই নয়, কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে তার আরশের ছায়া দেবেন। এর এক শ্রেণি হলো যারা দুনিয়াতে একে অন্যের সাথে আল্লাহর জন্যই সম্পর্ক গড়েছে আর আল্লাহর জন্যই কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

যেদিন অনিন্দ্য সুন্দর জান্নাতের বাজারে আল্লাহর মনোনীত বান্দারা এক হবে, যেদিন শীতল পানির ঝর্না পাড়ে কিংবা নয়ানাভিরাম বাগানে আল্লাহর মুত্তাকিরা একত্রিত হবে, সত্যিকারের বন্ধুত্বের হ্যাপি এন্ডিং তো সেদিন।

আল্লাহ যেন দুনিয়াতে আমাদের এমন বন্ধুদের সাথে রাখেন যারা জান্নাতে গিয়েও আমাদেরকে মিস করবে। মৃত্যুর পরও যাদের সিনা আমাদের সিনার সাথে লেগে থাকবে। যারা ইয়াউমাল কিয়ামাহর কঠিন দিনে আমাদেরকে আল্লাহর আরশের ছায়ায় নিয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

---

[৪] Pearls of Imaam Shafi'iy

[৫] বুখারি : ২১০১, মুসলিম :২৬২৮

সুখে থাকা মানে অনেক কিছু থাকা নয়
সুখে থাকে মানে, সুখে থাকা।

ভারতের টিভি শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' তে ৫ কোটি রুপি জিতেছিল সুশীল কুমার নামে একজন। সুশীল কুমার ভারতের বিহারের খুবই সাধারণ একজন মানুষ। অতি সাধারণ পরিবার, আর দশটা সাধারণ ভারতীয়র মতো আইএএস (আমাদের বিসিএস এর মতো) এর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, বিয়েও করেছিল। এই সাধারণ মানুষটার জীবন পুরো পাল্টে যায় সেই ৫ কোটি রুপি জয়ের পর। হুট করে একদিন সে যেন হিরো হয়ে গেল। মিডিয়া সারাদিন লেগে থাকত তার পিছে। ৫ কোটি রুপির কারণে চারপাশে মানুষের ভিড় লেগে থাকত। মাসে ১০-১৫টি অনুষ্ঠানে তাকে প্রধান অতিথি করে নিয়ে যাওয়া হতো। নানান মানুষ এসে তাকে বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করার বুদ্ধি দিতে থাকল। সুশীল ভাবল, এখানেই থেমে থাকলে চলবে না, আরও টাকা চাই, আরও বড়লোক হতে হবে। এরপর সে আরও বড়লোক হওয়ার আশায় ব্যবসা করার জন্য দিল্লি চলে এলো। হাতে টাকা, চারপাশে লোক জমতে সময় নিল না। নানান মানুষের সাথে মিশতে মিশতে সুশীল ধুমপান, নেশা শুরু করল। রঙিন দুনিয়ায় ভাসতে থাকা সুশীলকে কিছু সুযোগসন্ধানী বুদ্ধি দিল ছবি বানানোর। এরপর তার মাথায় ছবি বানানোর ভূত চাপল। ছবি প্রযোজনা করার নিয়তে সে মুম্বাই এলো। সেখানেও সুবিধা করতে পারল না। এদিকে রঙিন দুনিয়ায় হাবুডুবু খাওয়া সুশীলের পরিবার ভাঙতে বসেছে। স্ত্রী সুশীলের এই পাল্টে যাওয়া মেনে নিতে পারেনি।

যেসব জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করেছিল, প্রায় সবখানেই সে মার খেল। তারপরও তার আশেপাশে দুধের মাছিরা ভনভন করেই যাচ্ছে। তাই একসময় সবকিছু হারিয়ে সুশীল বলতে বাধ্য হলো, তার সব টাকা শেষ, এখন দুটো গরু কিনে তার

দুধ বেচে তার সংসার চলে। এরপর মানুষ তার কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। সুশীলের অতি সাধারণ জীবনটা তছনছ হয়ে গেল। টাকাপয়সা হারিয়ে নিঃস্ব হলো, নেশা ধরল, সাজানো সংসারটাও ভেঙে যাওয়ার পথে।

সুশীল কুমারের এই ঘটনা থেকে একটা গল্পের কথা মনে পড়ল। এই গল্পের যদিও অনেকগুলো ভার্সন আছে, তার একটা ভার্সন অনেকটা এরকম—একবার এক লোক নদীর ধারে বসে বড়শিতে মাছ ধরছিল। বিকেলবেলা, চারদিকে হু হু বাতাস, নদীর পার, সবমিলিয়ে খুব শান্ত পরিবেশ। এই পরিবেশে ঐ লোকের ঘুম চলে এলো। সে নদীতে বড়শি ফেলে আরাম করে নদীর পারে ঘুমোতে লাগল। এরমধ্যে নদী দিয়ে একটা ট্রলার যাচ্ছিল, সেখানে এক বিদেশি ছিল। বিদেশি দেখল নদীর পারে এক ব্যক্তি কী আরাম করে ঘুমোচ্ছে! সে চিন্তাও করতে পারছে না, এরকম জায়গায় কেউ এত নিশ্চিন্তে, এত প্রশান্ত হয়ে ঘুমোতে পারে! সে ট্রলার থামিয়ে ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে ওঠাল। জিজ্ঞেস করল, সে এখানে কী করছে! লোকটি বলল, বড়শি দিয়ে মাছ ধরছিল, এরমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিদেশি বলল, সে বড়শি দিয়ে কেন মাছ ধরছে, বড়শি দিয়ে কয়টা মাছই আর পাওয়া যাবে! তার উচিত বড় জাল কিনে সেই জাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরা। লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,

—বড় জাল দিয়ে মাছ ধরলে কী হবে?

—বিদেশি বলল, তাহলে অনেক মাছ পাবে।

—অনেক মাছ পেলে কী হবে?

—অনেক মাছ পেলে সেগুলো বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে।

—অনেক টাকা পেলে কী হবে?

—অনেক টাকা পেলে সেই টাকা দিয়ে যা খুশি তা কিনতে পারবে।

—যা খুশি তা কিনতে পারলে কী হবে?

—তাহলে সুখ পাবে, আনন্দ পাবে।

লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল, আরে হারামজাদা! আমি তো এতক্ষণ সুখেই ছিলাম, আনন্দে ছিলাম। কত আনন্দ নিয়ে মাছ ধরছিলাম, আরাম করে ঘুমোচ্ছিলাম। তুই ব্যাটা এসে আমার আরামের ঘুমটা ভেঙে দিলি। তুই যে সুখের কথা এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলছিস, সেটা অলরেডি আমার কাছে আছে।

সবকিছু হারিয়ে, সহজ সরল জীবনটা তছনছ করে সুশীল কুমার আবারও তার গ্রামে ফিরে আসে। আবার পড়াশোনা শুরু করে। সংসারে মন দেয়। এই কিছু সময়ের অভিজ্ঞতায় সুশীল জানায়, জীবনে যার যতটুকু আছে, সেটুকু নিয়ে সুখে থাকতে পারাটাই আসল।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।" (সূরাহ তাকাসুর, ১০২: ১-২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যদি কোনো মানুষের এক উপত্যকা ভরা স্বর্ণ থাকে, তবে সে তার জন্য দুটি উপত্যকা (ভর্তি স্বর্ণ) হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তার মুখ মাটি ছাড়া (মৃত্যু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) আর কিছুতেই ভরে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।"[৬]

এই দুনিয়ায় কারও পক্ষেই সত্যিকারের সুখের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে বড়জোর প্রতিযোগিতা করা যায়, দুনিয়ার পেছনে ছুটে সময়টা নষ্ট করা যায়। আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য হলো দুনিয়ার সময়টাকে কাজে লাগিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারা। এই লক্ষ্যে যারা স্থির থাকতে পারে, তাদের অন্তরে এমনিতেই প্রশান্তি চলে আসে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন

[৬] মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, হাদিস নং : ২৩০৫

আবরার ফাহাদ এবং সূরাহ বুরুজের সেই বালক ও রাজার গল্প

বুয়েটে নিহত আবরার ফাহাদের সর্বশেষ ফেসবুক পোস্টটা এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ২৭ হাজার লাইক এবং ৭০ হাজার বার শেয়ার হয়েছে। এটা দেখে সূরাহ বুরুজের সেই বালক আর রাজার কথা মনে পড়ল। এক রাজা ছিল যে নিজেকে আল্লাহ দাবি করত। কেউ তার বিরোধিতা করলেই তাকে মেরে ফেলা হতো। এরমধ্যে এক বালক রাজাকে আল্লাহ মানতে অস্বীকার করল। রাজা নির্দেশ দিল বালককে হত্যা করার। কিন্তু এক অলৌকিক কারণে বালককে হত্যা করা যাচ্ছিল না। তাকে পাহাড় থেকে ফেলে, পানিতে ডুবিয়ে নানাভাবে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু রাজার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রতিবারই ব্যর্থ। এরপর বালক নিজ থেকেই রাজাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিল। বালক বলল, আমি জানি আমাকে কীভাবে মারলে তুমি হত্যা করতে পারবে। যদি তুমি তীর নিয়ে সেটা **'বিসমিল্লাহ'** বলে আমার দিকে ছুড়ো, তবে সেই তীরের আঘাতে আমার মৃত্যু হবে। তবে শর্ত হলো সেটা করতে হবে জনগণের সামনে। বালক জানত এতে সে মারা যাবে, কিন্তু এর মাধ্যমে তার লক্ষ্য ছিল রাজার নিজেকে আল্লাহ দাবি করার এই অহমকে মিথ্যা প্রমাণিত করা। লোক জড়ো হলো, রাজা বিসমিল্লাহ বলে তীর ছুড়ল, বালক মারা গেল। রাজা ভাবল, যাক আপদ দূর হলো। কিন্তু এরপরেই ঘটল আসল ঘটনা।

নিজেকে আল্লাহ দাবি করা রাজা বালককে হত্যা করতে পারল না, তাকে **'বিসমিল্লাহ'** অর্থাৎ আল্লাহর নামে তীর ছুড়তে হলো। তাহলে বালক যে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলত, তিনিই আসল রব, অহংকারী রাজা মিথ্যে রব। ফলে এক আল্লাহর ইবাদাতে বিশ্বাসী বালকের মৃত্যুতে সেখানে উপস্থিত সমস্ত প্রজাদের মনে এটা গেঁথে গেল যে—বালক সত্যের উপর ছিল। তাই উল্টো সবাই ঈমান এনে ফেলল। সবাই রাজাকে আল্লাহ মানতে অস্বীকার করে বসল। রাজার সেটাও সহ্য

হলো না। বিশাল গর্ত খুঁড়ে সেখানে আগুন জ্বালানো হলো। বলা হলো যারা যারা ঈমান এনেছ তারা ঝাঁপ দাও! কী আশ্চর্য! হঠাৎ পাওয়া এই ঈমান তাদের কাছে এতটাই মূল্যবান হয়ে গেল যে, এর বিনিময়ে সবাই সেই আগুনে ঝাঁপ দিতেও পিছপা হলো না। এক মা তার দুধের বাচ্চা কোলে নিয়ে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিল, সেদিন সেই কোলের বাচ্চাও কথা বলে উঠেছিল। বলেছিল, মা আপনি এগিয়ে যান, আপনি হক্কের পথেই আছেন। কুরআনের সূরাহ বুরুজে আল্লাহ সেসব বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা সেদিন ঈমানের বিনিময়ে ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিল। আল্লাহ এই ঘটনাকে বলেছেন—

"জালিকাল ফাউযুল কাবির—আর এটাই মহাসাফল্য।" (সূরাহ বুরুজ, ৮৫: ১১)

আল্লাহ যেন আবরারকে জান্নাতে সূরাহ বুরুজের সেই বালকের প্রতিবেশী করেন।

মৃত্যু মানেই শেষ নয়, যালিমের হাতে নিহত হওয়া মানেই ব্যর্থতা নয়। মাঝে মাঝে একটা মৃত্যুই একটা জাতিকে জাগিয়ে দিতে পারে। ইখলাসের সাথে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছোট একটা কাজও অনেক বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

আকাশের ওপারে একটি অনিন্দ্য সুন্দর বাড়ি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এই বাড়িটি কার? সঙ্গি ফেরেশতা জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বাড়িটি সেই ব্যক্তির যে আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত হয়েছে। আমাদের রব যেন আবরারকেও এরকম একটা বাড়ির মালিকানা দান করেন। আমীন।

কিচ্ছু ভালো লাগে না

মাঝে মাঝে কিছু সময় আসে যখন আমাদের কিছুই ভালো লাগে না। হতাশ হতাশ লাগে। কিছুতেই মন বসে না। মনে হয় যেন বুকের উপর পাহাড় সমান কিছু এসে ভর করেছে—নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এই সময়গুলোতে সাধারণত আমরা 'ফ্রেশ' হওয়ার জন্য অনেককিছুই করি। গান শুনি, মুভি দেখি, বদঅভ্যাস থাকলে অনেকেই সিগারেট ফুঁকে, গাঁজা টানে, দুএক পেগ গিলেও ফেলে। কিন্তু সত্যিকারের বাস্তবতা হলো এর কোনোকিছুই আমাদের অন্তরকে শান্ত করতে পারে না, হয়তো কিছু সময়ের জন্য 'ব্যস্ত' রাখতে পারে মাত্র। বরং এরপর আরও ভয়ংকরভাবে বিষাদ আর অবসাদ এসে গ্রাস করে নেয়।

এরকম সমস্যা নিয়ে আমার ভার্সিটির বন্ধুবান্ধব আমার কাছে কাউন্সেলিং চাইতে আসত। অনেকে আবার মজা করে বলত তাদের মাথায় ফুঁ দিয়ে দিতে। আমি তাদেরকে বলি, আচ্ছা আমাদের খিদে পেলে আমরা কী করি? খাই! এতে আমাদের পেট শান্ত হয়। চোখের শান্তির জন্য আমরা ভালো কিছু দেখি। কানের জন্য আনন্দদায়ক কিছু শুনি। তেমনি শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিছু স্পেসিফিক কাজ আছে, সেই অঙ্গগুলো দিয়ে যখন তার স্পেসিফিক কাজটা হয় তখন সে ভালো থাকে। কিন্তু আমাদের যখন খুব খিদে পায় তখন আমরা ভালো কিছু দেখি না কেন? যখন ভালো কিছু শুনতে ইচ্ছে করে তখন পেট ভরে খাই না কেন? কারণ আমরা জানি এতে কোনো কাজ হবে না। পেটের খোরাক কান পূরণ করতে পারে না, চোখের খোরাক পূরণ করতে পারে না পেট!

ঠিক তেমনি আমাদের শরীরে এক টুকরো জায়গা আছে যেটা আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত কখনো শান্ত হয় না।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর সমূহ প্রশান্ত হয়।" (সূরাহ আর-রাদ, ১৩:২৮)

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে কিছু অস্থিরতা বিদ্যমান, যা শুধু আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব।"

কারণ অন্তর সৃষ্টই হয়েছে আল্লাহর স্মরণের জন্য, আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। ঠিক যেভাবে চোখ সৃষ্ট হয়েছে দেখার জন্য, কান শোনার জন্য। আর সেই হৃদয়ের জায়গাটুকু যখন তার কাজ ঠিকমতো করে না তখন পুরো মানবশরীরই বিদ্রোহ করে বসে। কোনো কিছুই আর ঠিকমতো হয় না। এই যে কিচ্ছু ভালো না লাগা, হতাশা, বিষাদ—সবকিছুর উৎপত্তি এখান থেকেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"...সাবধান! আমাদের শরীরে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে যা সুস্থ (পরিশুদ্ধ) থাকলে সারা শরীর সুস্থ থাকে, কিন্তু যদি তা কলুষিত হয়ে যায় সারা শরীর কলুষিত হয় এবং সেটি হচ্ছে হৃদয়।" (বুখারি)

আর আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু এই কারণেই যে, তারা আমার ইবাদাত করবে।" (সূরাহ আয যারিয়াত, ৫১:৫৬)

আর যখন শরীরের সেই মাংশপিণ্ড তার খোরাক পায় না তখন কী হয়? তখন আল্লাহর জমিন আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। জীবন সংকীর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

"যে আমার বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন, আর বিচার দিবসে আমরা তাকে উত্থিত করব অন্ধ করে।" (সূরাহ তা-হা, ২০:১২৪)

একজন আলিম বলেছিলেন, এক ব্যক্তি এসে ওনাকে বলল আমাকে যাদু করা হয়েছে, আপনি আমাকে ফুঁ দিয়ে দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে বুঝলে তোমাকে যাদু করা হয়েছে? সে বলল, আমার কিছুই ভালো লাগে না, কোনো কাজেই মন বসে না, মনে হয় যেন বুকের উপর ভারি কিছু এসে ভর করেছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। শাইখ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন? সে বলল, খুব খারাপ। শাইখ তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি আগে আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা ভালো করো, নামায পড়ো আর যদি কোনো গোপন গুনাহে লিপ্ত থাকো তা ছেড়ে দাও! এবং এর কয়দিন পর সেই লোকের সমস্যা সত্যি সত্যি কেটে গেল। সুতরাং দিনশেষে আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত আসলেই আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন?

সাহাবিদের সাথে আমাদের মূল তফাৎ এই জায়গাতেই, আমরা আমাদের হৃদয়ের জমিনকে আল্লাহর স্মরণ দিয়ে প্রস্তুত করিনি। আমাদের ঐ জায়গাটা সবসময়ই অপূর্ণ রয়ে যায়, সে কখনো শান্ত হয় না, সে কখনো প্রশান্তির খোঁজ পায় না। অথচ আমাদের আজ সুখ-শান্তি উপভোগের যত দুনিয়াবি উপকরণ আছে তার কিছুই সাহাবিদের ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা সুখে থাকত। তাদের কখনো হতাশ লাগত না, তাদের হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতো না। জান্নাতের একটা খেজুর গাছের বিনিময়ে পুরো সম্পত্তি দিয়ে দিয়ে আবু দাহদা আর তাঁর স্ত্রী খুব গরীব হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এরপরও তাঁরা সবসময় আনন্দিত থাকতেন, হৃদয়ের প্রশান্তির কারণে। চারদিন উপোষ থেকে অবশেষে একটা পচা খেজুর কুড়িয়ে খাওয়া আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরের প্রশান্তি ছিল তার রবের ইবাদাত।

সুতরাং আমরা আমাদের শরীরের বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর রাখতে, ভালো রাখতে যে পরিমাণ মেহনত করি, সেভাবে আমাদের হৃদয়টাকেও যেন একটু পরিচর্চা করি। তাকেও যেন একটু সময় দিই।

চক্র

স্কুল লাইফে সবসময় প্রথম হতাম। ভালো ছাত্রের তকমা বলতে যা বোঝায় সেটাও ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে যা হয়—পরিবার, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবার একটা বিশাল প্রত্যাশার চাপ থাকে। প্রতিবার নতুন ক্লাসে উঠলে কার রোল কত হয়েছে এসব নিয়ে সবাই আলোচনা করত, কিন্তু আমাকে নিয়ে কোনো আলোচনা হতো না। কারণ সবাই ধরেই নিত আমি প্রথম হবো। এর ফলে প্রচন্ড এক প্রত্যাশার চাপ থাকত সবসময়। স্কুল জীবনের প্রায় সব পরীক্ষাই আমি দিতাম গায়ে জ্বর নিয়ে। টেনশনের জ্বর, প্রথম স্থান থেকে সরে গেলে কী করে মুখ দেখাব এই টেনশন।

কেননা স্কুলের দিনগুলোতে আমাদের পুরো দুনিয়া জুড়ে ছিল কিছু প্রশ্ন—ক্লাসে কার রোল কত, ম্যাথে কে কত পেয়েছে, ইংলিশে হাইয়েস্ট কত উঠেছে। আমাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজনদের কাছেও ছোট্ট এই আমাদের বিচারের মানদণ্ড ছিল একটাই—ক্লাসে রোল নম্বর কত!

এরপর মাধ্যমিকে জিপিএ কত উঠেছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই শুরু হয়ে গেল 'কোন কলেজে ভর্তি হয়েছ' এই প্রশ্ন। চিটাগাঙে সাইন্সে পড়লে জাতে ওঠার মতো কলেজ হলো চট্টগ্রাম কলেজ আর মহসিন কলেজ। এই দুই কলেজে যারা ভর্তি হতে পারত তারা সিনা টান করে তাদের কলেজের নাম বলত। আর যারা অন্যান্য কলেজে ভর্তি হতো তারা গলার স্বর একটু নিচু করে, কেমন যেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কলেজের নাম বলত। যেন চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজে ভর্তি হতে না পেরে সে জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধটা করেছে। আমাদের সময়েই জিপিএ ফাইভ পানির ধরে না হলেও, তখন ভুরি ভুরি জিপিএ ফাইভ পাচ্ছিল। আমরা তিন বন্ধু আশা করে ছিলাম চট্টগ্রাম কলেজে না হলেও অন্তত মহসিন কলেজে তো হবেই। সেটাও হলো না। একজন তো ভর্তি হতে না পেরে ওয়েটিং রুম থেকে

বেরিয়ে রাগে ফরমটাই ছিঁড়ে ফেলল। কেউ জিজ্ঞেস করলে 'আমি চট্টগ্রাম কলেজে পড়ি', 'আমি মহসিন কলেজে পড়ি'—এটা ছিল আমাদের সময়ে কলেজ পড়ুয়াদের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। কেউ চট্টগ্রাম কলেজে পড়ে শুনলে সমবয়সীরা মুগ্ধ হয়ে তাকাত।

চোখের পলকেই কলেজ লাইফটা শেষ হয়ে যায়। জিপিএ কত এই প্রশ্নের চেয়ে মাস কয়েক পর সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয় ভার্সিটি ভর্তির সময়। স্কুলে ক্লাসে রোল কত, মাধ্যমিকে জিপিএ কত, কোন কলেজ, ইন্টারে জিপিএ কত.....সব প্রশ্ন অতীত হয়ে যায়। জীবনের এখন একটাই পরিচয়—কোথায় পড়ো, কোন ভার্সিটি? ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি হলে সাত খুন মাফ। ভার্সিটি তাও ঢাকা ভার্সিটি হলে চলে, কিন্তু দেখতে হবে কোন সাবজেক্টে পড়ে!

চার-পাঁচ বছরের ভার্সিটি লাইফের এক উড়ন্ত জীবন কাটিয়ে ছোট্ট সেই আমরা একদিন অনেক বড় হয়ে যাই। মানুষ এখন অতীতের সবকিছু ভুলে শুধু খোঁজ করবে—কোথায় আছো এখন? বেতন কত পাও? দিনশেষে এটাই কাউকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড।

স্কুল লাইফ থেকে ভার্সিটি অবধি সব ধাপেই মানুষের এই যে প্রশ্নগুলো—ক্লাসে রোল কত, বৃত্তি পেয়েছো কি না, জিপিএ ফাইভ পেয়েছো কি না, কোন কলেজ, কোন ভার্সিটি—সব প্রশ্নের ভালো জবাব দিতে পেরেছে এমন ছেলেগুলো একদিন 'ভালো চাকরি', 'ভালো ক্যারিয়ার' গড়তে না পেরে মানুষের সামনে যেতে লজ্জা পায়, এমনও দেখেছি। সারাজীবন বাউন্ডুলে জীবন কাটানো ছেলেটা, যার কোনো ভবিষ্যৎ নেই বলে সবাই বলাবলি করত, সে এখন ভালো চাকরি করে, মোটা বেতন পায় বলে মানুষ বলে—'ছেলেটার কিন্তু বেসিক ভালো ছিল, এসব রেজাল্ট ভালো করে কী লাভ, বেসিক ভালো থাকলে লাইফে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না।' অথচ এই কথাগুলো যদি স্কুলের ঐ ছোট্ট ছেলেটাকে সে সময় বলা হতো, যদি তাকে এতটুকু আশ্বাস দেওয়া হতো—রেজাল্ট বড় কথা না, বড় কথা হলো বেসিক ঠিক করা, শেখা, জানা!

জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়গুলো আমরা এভাবে মানুষের মন রাখার পেছনে, টেনশনে, ভয়ে, আতঙ্কে কাটিয়ে দিই। অথচ দিনশেষে আমাদের একটাই পরিচয়—কী চাকরি করি, কত বেতন পাই...ইত্যাদি।

মানুষ কী বলবে, মানুষকে কী জবাব দেব—এই চিন্তাটাই আমাদের সুখ কেড়ে নেয়। সমস্ত শান্তি বিনষ্ট করে দেয়। এই ভয়কে যে জয় করতে পারে, মানুষ কী

ভাববে, কী বলবে, এটাকে যে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে—সেই সুখে থাকে।

প্রতিবার এসএসসি, এইচএসসির রেজাল্টের পর ভালো রেজাল্ট করতে না পেরে, পরিবারের চাওয়া পূরণ করতে না পেরে, পরিবারের, সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না বলে অনেকেই আত্মহত্যা করে। এগুলো দেখে মন খারাপ হয়। সামান্য রেজাল্টকে এরা জীবনের চেয়ে মূল্যবান ভেবে বসে আছে। টেনশনে, আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

কার জন্য টেনশন করবে? কার ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে? তোমার চারপাশের মানুষগুলোর জন্য? তারা কী বলবে এই ভয়ে? বাবা-মা কী বলবে এই ভয়ে? এই আমাকে দেখো, আমি একসময় ক্লাসে সবসময় প্রথম হতাম এটা কারও কাছে এখন কোনো মূল্য নেই। একসময় প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় ম্যাথে কত পেয়েছি, ইংলিশে কত পেয়েছি এর কোনো কিছুরই কোনো মূল্য কারও কাছে নেই। ক্লাস এইটে বৃত্তি, মাধ্যমিকে জিপিএ ফাইভ—কেউ কোনোকিছু মনে রাখেনি। অথচ এগুলোর জন্য তখন আমরা চোখের ঘুম হারাম করেছি, পেটে ভাত হজম হয়নি। তোমার এতদিনের এত এত সার্টিফিকেট, মেধার কোনো মূল্য নেই কারও কাছে, এমনকি তোমার পরিবারের কাছেও না। স্কুলে ঝরে পড়া তোমার বন্ধুটা বিদেশ গিয়ে কাঁচা টাকা কামিয়ে গর্দান মোটা করে ফিরেছে—তার টাকার দাম তাদের কাছে তোমার মেধা আর সার্টিফিকেটের চেয়ে বেশি। সুতরাং তুমি কাদের কথা ভেবে টেনশন করছ, কাদেরকে ভয় পাচ্ছ? বিশ্বাস করো 'মানুষ কী বলবে' ভেবে যে মানুষ আর সমাজকে ভয় পাচ্ছ, তুমি কোনোদিন তাদেরকে খুশি করতে পারবে না। তারা কোনোকিছুতে সন্তুষ্ট হবে না।

এই দুনিয়া, এই সমাজ, এই সিস্টেম চায় তুমি দৌড়ের উপর থাকো, তুমি ছুটতেই থাকো। এতটুকু অবসর সে তোমাকে দিতে চায় না। সে তোমাকে জীবনের সব সত্য থেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। সত্যটা হলো এই জীবনে আমাদের সত্যিকারের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী! সত্যটা হলো একদিন আমাদেরকে আমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। সত্যটা হলো আমরা আমাদের প্রতিটি কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকব। দুই কাঁধের দুই ফেরেশতা, তারা লিখবে না তুমি কোন কলেজের স্টুডেন্ট, তারা লিখবে না তুমি ইন্টারে কী রেজাল্ট করেছ, তারা লিখবে না তুমি কোথায় চান্স পেয়েছ, লিখবে না তুমি কত ভালো চাকরি করো, কত বেতন পাও।

নিজেদের লাইফের পারপাস ঠিক নেই বলে আমরা এখনো পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে মন খারাপ করি, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে পারি। যার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, যার জন্য জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দিচ্ছি—সেই দুনিয়া আর এর মানুষগুলো কোনোদিনও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না। তুমি যদি দুইটা সোনার পাহাড়ও তাদের সামনে হাজির করো, তারা মুখ বাকিয়ে বলবে, সব ঠিক আছে কিন্তু বামপাশের পাহাড়টা ডানপাশের চেয়ে একটু ছোট মনে হচ্ছে! কেমন মলিনও লাগছে! That's dunya brother, that's dunya! এসএসসির জিপিএ ফাইভ এরা ভালো কলেজে ভর্তি হতে না পারলে ভুলে যাবে, ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার গর্ব জিপিএ ফাইভ না পেলে মিইয়ে যাবে, জিপিএ ফাইভ এর গৌরব ভালো কোথাও চান্স না পেলে হারিয়ে যাবে। আর সবকিছুই বৃথা যাবে ভালো চাকরিটা না পেলে! মোটা অঙ্কের বেতন না পেলে। তোমার চেয়ে অন্য কেউ টাকা বেশি কামাই করলে! এটাই দুনিয়ার ধর্ম।

আমি বলছিনা তোমাকে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে। তবে নিজের জীবনের পারপাস নিশ্চিত করাটা খুব বেশি জরুরি। ততটুকুই যেন তোমার উদ্দেশ্য হয় যতটুকুতে এই দুনিয়া পার হওয়া যাবে। এই দুনিয়া একটা পাগলা ঘোড়ার মতো। এর উপর সওয়ার হয়ে তুমি এর লাগাম ধরে রাখতে পারবে না। এটা তোমাকে মাটিতে ফেলে দেবে, তোমাকে পাড়াবে, রক্তাক্ত করবে, তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করবে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো আখিরাতের ঘোড়ার উপর সওয়ার হওয়া। তবে এই রাস্তাটাও সহজ নয়। প্রয়োজন সবর, ঈমান, তাওাক্কুল আর ইবাদাত গুজার হওয়া। এখানে তুমি কখনোই চিরস্থায়ী সুখ পাবে না, নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। তার জন্য আমরা এখানে আসিওনি। তাহলে আমাদের শান্তি কোথায়, চিরস্থায়ী নিশ্চিত জীবন কোথায়? সেটা আখিরাতে, জান্নাতে।

আল্লাহ আমাদেরকে সেদিনের জন্য আমল করার, সেদিনের জন্য টেনশন করার, সেদিনের জন্য ভীত হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

যে জীবন ফড়িঙের,
যে জীবন জোনাকির,
সে জীবন যেন আমার না হয়...

ক্যাম্পাসে একটা টং দোকানে আমি নিয়মিত চা খেতে যেতাম। দুধ চা খেলেও সাথে একটু আদা দিতে বলতাম। একসময় খেয়াল করলাম আমাকে আর আদা দিতে বলতে হয় না। দোকানদার নিজ থেকেই আদা দিয়ে দেয়। চায়ের বিল নেওয়ার সময়, বিল নিয়ে বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার সময় বেশ বিনয়ের সাথে এক হাত বাড়িয়ে আরেক হাত কুনুইয়ের কাছে ধরে সে বিনয়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এই কাজটা সে আগে করত না। এই কাজটা শুরু হয়েছে যখন থেকে আমি পাঞ্জাবী, টুপি পরে তার দোকানে যাওয়া শুরু করলাম।

ব্যাপারটা ভালোই লাগে। আপনার ইসলামি লেবাসের জন্য আরেকজন আপনাকে সম্মান করছে এর মধ্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার ব্যাপার আছে। কিন্তু এই সমাজ, এই রাষ্ট্র, আপনার আমার পরিবার, ইসলামকে সহ্য করবে একটা পর্যায় পর্যন্ত। একটা সীমা পর্যন্ত তারা আপনার ইসলামকে খোলা মনে গ্রহণ করবে। কিন্তু যখনই আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায, দুই ঈদ, শেষ বয়সে একবার হজ্জ—এই ইসলামের সীমানা ডিঙিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাওহিদ আর কালিমার পরিপূর্ণ ইসলামের কথা বলবেন তখনই আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন There is something wrong with the people around you. যে দোকানদার হুজুরকে এত সম্মান করছে তাকে নামাযে ডাকলে, নামাযের সময় দোকান বন্ধ রাখতে বললে, বিড়ি-সিগারেট বেচা হারাম বললে, একসময় সে আপনাকে আর আগের মতো দেখবে না। হুজুরের অনধিকার চর্চায় তখন সে হবে চূড়ান্তভাবে বিরক্ত—পরীক্ষিত সত্য।

১৪০০ বছর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উম্মাতের জন্য রহমত স্বরুপ পাঠিয়েছিলেন একজন মহামানবকে। সারা মক্কাবাসী তাঁকে এক নামে চিনত। আল-আমিন হিসেবে তাঁর ছিল সুখ্যাতি। তাঁকে সবাই ভালোবাসত, তাঁর কাছে আমানত রাখাকে নিরাপদ মনে করত, তাঁর প্রতি ছিল সকলের অগাধ বিশ্বাস। এই মানুষটিই যখন মহান আল্লাহর একত্ববাদ আর তাওহিদের সত্য প্রচার করা শুরু করেন—তখন আমরা দেখেছি তাঁর সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছিল। এতদিন যারা তাকে এক বাক্যে বিশ্বাস করত তারাই তাকে পরিত্যাগ করল। মক্কার গোত্রীয় নেতাদের ডেকে তাওহিদের বাণী শুনিয়ে সেই আল-আমিন যখন জিজ্ঞেস করলেন, "কে কে আছ আমার সাথে?"—আট বছরের এক বালক ছাড়া সেদিন কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। একসময় সকলের কাছে প্রিয় পাত্র **'আল আমিন'** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরই তারা চালাল অত্যাচার, তাঁকে করল বিতাড়িত, তাঁর সাথে করল যুদ্ধ। এটাই সত্য—এটাই ইসলামের পথে চলার পূর্বশর্ত যে আপনাকে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে হবে—হতে হবে অত্যাচারিত। সেক্রিফাইস করতে হবে জীবনের প্রিয় সব বস্তু। হ্যাঁ, এটাই ইসলাম—এটাই তাওহিদ।

দুনিয়াবি ক্যারিয়ার গড়তে জান-প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে, দিনে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়ে, সামাজিক ছবি(!) দেখে আর জীবনবোধের গান(!) শুনে, চেতনা অন্তরে লালন করে, টেবিলভর্তি সেক্যুলার বইয়ের উপর কাপড়ে বাঁধা কুরআনে সাজানো রুম—এই ছেলেটারই সমাজ থেকে মিলবে 'গুড বয় ইমেজ'। আখিরাতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে দুনিয়ার অর্জনগুলোতে ছাড় দেওয়া ছেলেটার শুনতে হবে—অমুক তো তোর মতোই নামায-রোযা করে, সে কি সব করছে না! কী করে বোঝাই, ঐ জীবন ফড়িঙের, ঐ জীবন জোনাকি পোকার। কী করে বোঝাই এই জীবনে পৃথিবীর ওপারে কিছুই নেই। কী করে বোঝাই—আমি ঐ জীবন চাই না।

মুসআব ইবনু উমায়ের ছিলেন মক্কার ধনী পরিবারের আদরের সন্তান। চাকচিক্য আর আভিজাত্যে তাঁর মতো খুব অল্প ছেলেই ছিল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষজন মুগ্ধ চোখে তাকাত। সেই মুসআব ইবনু উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে হয়ে গেলেন বিপরীত মেরুর মানুষ। তাওহিদকে গ্রহণ করায় তাঁর উপরও এসেছিল অত্যাচারের খড়গ। আদরের ছেলেকে তাঁর মা মারধর করত, বন্দি করে রাখা হতো ঘরে। তিনি যখন হিজরত করতে চাইলেন আর তাঁর মা তাতে বাধা দিলেন এবং ছেলেকে বন্দি করে রাখতে চাইলেন তখন এক বুক আবেগ নিয়ে তিনি তাঁর মাকে বলেছিলেন, "যদি তুমি এমনটি করো এবং যারা তোমার এই কাজে সাহায্য করবে, তোমাদের সবাইকে আমি হত্যা করব।"

মদিনায় একদিন মুসলিমদের একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে বসে ছিলেন। এমন সময় পাশ দিয়ে তারা মুসআবকে যেতে দেখলেন। তাকে দেখে উপস্থিত সবার ভাবান্তর হলো, কারও দৃষ্টি নত হয়ে গেল, কারও কারও চোখে পানি এসে গেল। কারণ মুসআবের গায়ে তখন শত তালি দেওয়া জীর্ণশীর্ণ একটি চামড়ার টুকরো। তাতে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অথচ ইসলাম পূর্ব জীবনে তাঁর পোশাক ছিল বাগিচার ফুলের মতো কোমল চিত্তাকর্ষক ও সুগন্ধিময়। এ দৃশ্য দেখে মুচকি হেসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "মক্কায় আমি এই মুসআবকে দেখেছি। তাঁর চেয়ে পিতামাতার অধিক আদরের কোনো ছেলে মক্কায় ছিল না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বাতে সবকিছু সে ত্যাগ করেছে।"

উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর কবর দিতে গিয়ে এই মুসআবের জন্য ছোট্ট এক টুকরো কাপড় পাওয়া গিয়েছিল যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা দেখা যায়, পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসআবের লাশের পাশে দাড়িয়ে পাঠ করলেন,

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

"...মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে তাঁদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে।" (সূরাহ আহযাব, ৩৩: ২৩)

সর্বপ্রথম মুহাজির ছিলেন আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে হিজরত করতে চাইলেন তখন তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর স্ত্রীকে যেতে দিল না। তাঁর বাচ্চা নিয়ে তাঁর পরিবার আর শ্বশুরবাড়ির লোকজন টানাটানি শুরু করে দিল যাতে তাঁর বাচ্চার একটি হাত উৎপাটিত হয়ে যায়। স্ত্রী সন্তানকে ফেলে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে হিজরত করেছিলেন আবু সালামা। এ ঘটনার পর থেকে স্বামীর মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং সন্তান থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর উম্মে সালামার অবস্থা ছিল—প্রতিদিন ভোরে তিনি আবতাহে চলে যেতেন, যেখানে স্বামী-সন্তান থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সেখানে কাঁদতে থাকতেন। এভাবে আত্মীয় পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, কাফিরদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে তারা তাওহিদের ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন।

মাঝে মাঝে কিছু আলিমের বই দেখি, লেখক শাইখের নামের পাশে লেখা May Allah hasten his release, May Allah save him। পরিবার পরিজন, দুনিয়ার সুখ-শান্তির মোহ ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আজও কিছু মানুষ

তাওহিদের ঝাণ্ডা বহন করে চলেছে। সত্য আর হক্কের বার্তা প্রচারের অপরাধে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে কারাগারে। তারা হয়তো দুনিয়ার মানুষের কাছে কোনো পরিচিত বা মুখে মুখে উচ্চারিত নাম নয়, তাঁদের বিশাল অডিটোরিয়ামে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হয় না, তারা হয়তো কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ। কিন্তু তারা ঘাস ফড়িঙের জীবন বেছে নেয়নি—বেছে নেয়নি জোনাকি পোকার জীবন। বেছে নিয়েছে সিনা টান করে দাঁড়ানোর জীবনকে। বেছে নিয়েছে সেই সময়টাকে—যখন আমরা সবাই আমাদের রবের সাথে মিলিত হবো একাকী—সম্পূর্ণ একাকী।

ছোটবেলায় আমরা একটা খেলা খেলতাম। ঘাসফড়িঙ ধরে লেজে একটা সুতো বেঁধে দিতাম। তারপর এটাকে নিজেদের ইচ্ছেমতো উড়াতাম। যখন সে উড়ে কিছুদূর যেত, সুতো ধরে টান দিতাম, সে আবার মাটিতে পড়ে যেত। আবার উড়ত আবার টান দিতাম। এভাবে বিশাল আকাশে ছুটে বেড়ানো ঘাসফড়িঙ আমাদের ইচ্ছের কাছে বন্দি হয়ে যেত। আরেকটা মজার কাজ করতাম রাতের বেলা। জোনাকি পোকা ধরে এনে হাতের মুঠোতে রাখতাম। তারপর সেই পোকা নিয়ে অন্ধকারে যেতাম আর বলতাম, "দেখ দেখ আমার হাতে আলো জ্বলছে।" অথচ আলোটা আমার ছিল না, ছিল হতভাগা জোনাকি পোকার—যে আমার হাতে বন্দি। যার আলো শুধু রাতেই থাকে, দিনের আলোতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না—দিনের আলোতে তাকে কেউ মনেও রাখে না।

এই দ্বীন ইসলাম, এই তাওহিদ, এই ঈমান হঠাৎ করে একদিনে গড়ে উঠে না। মন থেকে চাইতে হয়, চেষ্টা করতে হয়। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে হয়। লোকে কী বলবে, এই ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে দাড়ি ছেড়ে দিতে হয়। জাহিল বন্ধুদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গ ছেড়ে সমাজে গুরাবা হতে হয়, অপমানিত হতে হয়। অনেক না পাওয়ার বেদনায় দগ্ধ হওয়া, অনেক দীর্ঘশ্বাস চেপে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু তা না করে দুনিয়ার কিছু সস্তা প্রাপ্তির জন্য তাওহিদের বাণীকে মাড়িয়ে যাওয়া, নিজের দ্বীন বিকিয়ে দেওয়া এ জীবন ঐ ফড়িঙের মতো, ঐ জোনাকি পোকার মতো।

এই দ্বীন পালন যেন উত্তপ্ত মরুভূমিতে একাকী পথ চলা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ছুটে চলা, থমকে যাওয়া, মাটিতে গড়িয়ে পড়া, শীতল পানিতে তৃষ্ণা মেটানো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গাছের ছায়ায়। উস্কোখুস্কো চুল, ধুলোমাখা পা, জরাজীর্ণ জামা—অবশেষে এই দৌড় প্রতিযোগিতার শেষ প্রান্তে পৌঁছা। যার পরের কদম থেকেই আল্লাহ আযযা ওয়া যাল আমাদের দিয়েছেন অনন্ত সুখের প্রতিশ্রুতি।

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

"তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।" (সূরাহ আল বাইয়্যিনাহ, ৯৮: ৮)

আমি মনে প্রাণে চাই আল্লাহ আমাদের সেই জীবনের স্বপ্ন অন্তরে বুনে দিন যে জীবন আল্লাহর জন্য বাঁচে। যে জীবন ঘাস ফড়িঙ কিংবা জোনাকি পোকার মতো বন্দি নয়। যে জীবন অনেকের ভিড়ে পরাজিত, অধঃপতিত মানসিকতার নয়। যে জীবন এক বিঘত বুকে বিশাল আকাশ ধারণ করে বাঁচে। যেদিন বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে যাবে শত্রুর আঘাত, মাটিতে গড়িয়ে পড়বে প্রথম রক্তবিন্দু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দেখিয়ে দেবেন জান্নাতে আমাদের ঘর, সেদিন— সেদিন হয়তো আকাশের ওপারের ঐ জীবনের জন্য কিছু সঞ্চয় হলো। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমাদের অক্ষমতা আর অবহেলাকে ক্ষমা করুন। আমাদের সময়ে বরকত দিন। তাঁর দ্বীনের সাথে আমাদের অন্তরটাকে বেঁধে নিন। আমীন।

গোপন পাপ

একসময়ের বিখ্যাত গলফ খেলোয়াড় টাইগার উডস। ছিলেন সবচেয়ে ধনী স্পোর্টসম্যান। নাম, যশ, খ্যাতি, অর্থ, সম্মান—এক জীবনে আর কী চাই! কিন্তু একদিন খুব ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিমিষেই তার সমস্ত কিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসার মতো, তার জীবনের সমস্ত অপকর্ম বেরিয়ে এলো। জানা গেল বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য নারীর সাথে সে পরকীয়া, যৌনাচার করে বেড়াচ্ছে। তার সুখের সংসার ভাঙার উপক্রম হলো, সব স্পন্সররা তার সাথে চুক্তি বাতিল করল। দুনিয়াজুড়ে তার কোটি কোটি ভক্তের কাছে নিমিষেই এক হিরো হয়ে গেল ভিলেন। সেই মাঠেও আর সেভাবে কখনো পারফর্ম করতে পারেনি। একটি ঝলমলে তারকার কী কুৎসিত পতন।

হলিউড মিডিয়া মোগল হার্ভে ওয়েনস্টেইন, হঠাৎ একদিন তার বিরুদ্ধে একজন যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনে। এরপর যা হয়েছে তা রীতিমত ইতিহাস। একে একে তার সমস্ত অপকর্ম বের হয়ে আসে। তৈরি হয় #metoo আন্দোলন। সেই আন্দোলনের ঝড়ে হলিউড-বলিউড থেকে সবখানে নামিদামি সব অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক সকলের আকাম কুকাম সব বের হয়ে আসতে শুরু করে। এদের অনেকেই ফেঁসে গেছেন রীতিমত দশ-বিশ বছর আগের নানান কুকর্মের জন্য।

সম্প্রতি চিটাগাঙে এক ডাক্তারের আত্মহত্যার একটা ঘটনা সারাদেশে ভাইরাল হয়েছে। সে তার স্ত্রীর পরকীয়ার প্রমাণসহ সবকিছু ফাঁস করে নিজে আত্মহত্যা করেছে। মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে একজন শিক্ষিত, ডাক্তার, আদর্শ স্ত্রী, পুত্রবধু নিমিষেই কী কুৎসিত চরিত্রের নারী হিসেবে সারাদেশের মানুষের কাছে এক্সপোসড হয়ে গেল। এর একদিন আগেও হয়তো মেয়েটি এরকম কিছু স্বপ্নেও ভাবেনি। সবকটা পত্রিকা, সারা ফেসবুকজুড়ে তার এই অপকর্ম ফলাও করে প্রচার হয়েছে।

চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় তার এসব অপকর্মের ছবি সম্বলিত পোস্টার লাগানো হয়েছে। তার শাস্তির জন্য মানববন্ধন হয়েছে অনেক জায়গায়।

এমনকি ইসলামি লেবাসধারী অনেকেরও দীর্ঘদিন ধরে চলা এরকম গোপন পাপের গোমর হঠাৎ একদিন ফাঁস হয়ে যায়। ফেনীর লম্পট মাদ্রাসা অধ্যক্ষ তার সাম্প্রতিক উদাহরণ। এরকম উদাহরণ মোটেই বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এভাবে পর্দার আড়ালে মানুষের গোপন পাপ, খেয়ানত, দুর্নীতি, নারী কেলেঙ্কারি, চারিত্রিক কলুষতা বের হয়ে এলে মানুষের নিতান্ত সহজ সরল চরিত্রের আসল রূপও বের হয়ে আসে।

একজন মানুষের বড় শাস্তি হলো আত্মসম্মান হারানোর শাস্তি। সামাজিকভাবে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে একঘরে হয়ে যাওয়ার শাস্তি। গোপন পাপ প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে মানুষ এই শাস্তির মধ্য দিয়ে যায়।

আত্মহত্যা করা ডাক্তারের স্ত্রী সেই ঘটনায় জেলে গিয়েছিল। তার কী শাস্তি হবে আমি জানি না, কিংবা আদৌ কোনো শাস্তি হবে কি না সেটাও জানি না। কিন্তু তার আত্মসম্মানের যে মৃত্যু হয়েছে, সারা দেশের মানুষের কাছে তার ব্যক্তিত্বের যে মৃত্যু হয়েছে, সামাজিকভাবে তার সম্মান আর স্ট্যাট্যাসের যে পতন হয়েছে, তার পরিবার যেভাবে মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না—এ এক ভয়াবহ শাস্তি।

মহান রব যে আমাদের পাপগুলো গোপন রাখেন, এটা তাঁর রাহমাহ। কিন্তু মানুষ যখন প্রতিনিয়ত গোপন পাপে লিপ্ত হয়ে নিজের উপর যুলুম করেই যায়, তখন আল্লাহ তার কিছু পাপকে মানুষের সামনে নিয়ে আসেন। তাকে নিবৃত করার জন্য।

শাইখ আবদুল আযীয আত তারিফী বলেন,

> "আল্লাহ দুটি কারণে মানুষের দোষ প্রকাশ করে দেন:
>
> —যদি সে অন্যের দোষ প্রচার করে বেড়ায়।
>
> —যদি সে গোপনে অতিরিক্ত গুনাহ করে, তাহলে এর কিছু অংশ প্রকাশ করে আল্লাহ তাকে ও অন্যদের নিরস্ত করেন।"[৭]

এটা দুনিয়ার শাস্তি। আখিরাতের শাস্তি আরও ভয়াবহ, সেদিনের শাস্তি আরও আফসোসের। সেদিন সারা মানবজাতির সামনে আমাদেরকে বেইজ্জত হতে হবে। দুনিয়াতে আমাদের সকল গোপন কর্ম সেদিন ফাঁস হয়ে যাবে।

---

[৭] সবুজ পাতার বন, পৃ ৩২, সীরাত পাবলিকেশন

ইবনু মাজাহতে সহিহ সনদে এসেছে, সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমল সহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদাত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।"[৮]

গোপন পাপের এই ফাঁদ থেকে নিজের মানসম্মান, নিজের আত্মাকে, নিজের দুনিয়া আখিরাত হিফাযত করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর কাছে খালেস মনে তাওবা করা। সমস্ত পাপ থেকে, সমস্ত কুকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা, এবং আর কখনো সেই পাপের জগতে ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া।

কিন্তু আমাদের গোপন পাপগুলো দুনিয়াতে মাফ হলেও যদি আখিরাতে সেগুলো ফাঁস হয়ে যায়?

রামাদানের শেষ দশদিনে একটি দুআ করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। দুআটি হলো-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

> অর্থাৎ "হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল এবং ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

এখানে 'ক্ষমা করা' অর্থে 'গাফুর' শব্দটি ব্যবহার না করে 'আফুউ' ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও শব্দ দুটির অর্থ একই, তাহলে 'আফুউ' ব্যবহার করার কারণ কী? ওলামাদের কারও কারও মতে আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু আপনার গুনাহগুলো তারপরও লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং বিচার দিবসে আপনাকে এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অর্থাৎ আপনাকে মাফ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত

---

[৮] ইবনু মাজাহ: ৪২৪৫

সেগুলো মুছে ফেলা হবে না। বুখারিতে বর্ণিত একটি হাদিসে এই ধরনের একটি কথা উল্লেখ আছে।

হাদিসটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে নিজের সান্নিধ্যে আনতে থাকেন, আর তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন, তুমি কি নিজের অমুক গুনাহর কথা মনে করতে পারো? বান্দা বলবে, হ্যাঁ পারি। এরপর আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার তমুক গুনাহর কথা মনে করতে পারো? বান্দা আবারও বলবে, হ্যাঁ পারি। এভাবে বান্দা যখন নিজের সকল গুনাহর কথা স্বীকার করে নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি ইহকালে তোমার এই গুনাহগুলোকে গোপন রেখেছিলাম আর তারপর ক্ষমা করে দিয়েছি। ওলামারা বলেন এটা হলো 'মাগফিরাহ'।

তাহলে 'আফুউ' কী? 'আফুউ' এর থেকেও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ক্ষমা। 'আফুউ' হলো যখন আল্লাহ তাআলা আপনার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবার পর তা পুরোপুরি মুছে ফেলেন। এমনকি বিচার দিবসেও সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বান্দা এবং ফেরেশতাদেরকেও এই গুনাহগুলোর কথা ভুলিয়ে দেন, যেন বিচার দিবসে আপনাকে এসব গুনাহর জন্য অপমানিত হতে না হয়। মানুষ তার পাপ কর্মের জন্য যখন একেবারে মন থেকে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হয়ে এই ধরনের ক্ষমা করে থাকেন।

এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এবং সম্মানজনক ক্ষমা। কুরআনে খেয়াল করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা যখন সবচেয়ে গুরুতর গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন বা মানুষকে অন্যদের কোনো গুরুতর ব্যাপারে মাফ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, তখন 'আফুউ শব্দটি ব্যবহার করেন।[৯]

আল্লাহ যেন আমাদেরকে গোপন পাপ থেকে হিফাযত করেন। এই দুনিয়া আর আখিরাতে বেইজ্জত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে 'আফুউ' দান করেন। পাপগুলো এভাবে মুছে দেন যেন আমাদের রব ছাড়া আর কেউ না জানে। আমীন।

[৯] ধূলিমলিন উপহার রামাদান, পৃ ১৫৮-১৫৯, সীরাত পাবলিকেশন।

ফ্যানটাসি ওয়ার্ল্ড

কলেজের সেই দুরন্ত সময়ে বিপ্লবের এক শিহরণ নিয়ে 'থ্রি ইডিয়টস' মুভিটা দেখেছিলাম। তুখোড় মেধাবি এক ছেলে রানচোড় দাস একের পর এক সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের চিন্তাচেতনার ভুলগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যেন সমাজ পরিবর্তন করে দেওয়ার সব ফর্মুলা ছবিতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একসময় আমি আবিষ্কার করলাম, এর সবকিছুই বাস্তবতা বিবর্জিত একটি গল্পের স্ক্রিপ্ট মাত্র। ছবির স্ক্রিপ্ট যিনি লিখেছেন তিনি এমন একজনকে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের গল্প সাজিয়েছেন—যে অনাথ, তার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই। পরিবার নেই, পিছুটান নেই, দায়িত্ব নেই, পরিবারের হাল ধরার টেনশন নেই। লেখক কেন সমাজ পরিবর্তনের জন্য রাজু দাস্তগির কিংবা ফারহান কোরেশিকে বেছে নেননি? কারণ এদেরকে বেছে নিলে ছবির স্ক্রিপ্টটা হতো না। তাহলে আমাদেরকে সম্মুখীন হতে হতো বাস্তবতার। কারণ এদের পরিবার আছে, ঘরে অসুস্থ বাবা আছে, অবিবাহিত বোন আছে, দায়িত্ব আছে, পিছুটান আছে।

কলেজের সেই সময়টাতে—যখন মনে হতো হাওয়ায় ভাসছি—আর দশজনের মতো আমারও মনে হতো রানচোড় দাসের মতো জীবনই আমাদের বেছে নিতে হবে। কিন্তু যতই সময় গেছে আমি উপলব্ধি করেছি রানচোড় দাস বাস্তবে এক্সিস্ট করে না। সারারাত হাসপাতালে ঘুমিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল আজ সকালে ফাইনাল পরীক্ষা—দৌড়ে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এসে প্রথম হওয়া বাস্তবে যায় না। আমি আরও বুঝেছি দায়িত্ব-কর্তব্য-পিছুটানহীন রানচোড় দাসদের দিয়ে সমাজ পরিবর্তন হয় না। ছবিতে হয়, বাস্তবে হয় না।

খালি পায়ে হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কল্পনার হিমু বাস্তবে এক্সিস্ট করে না। এখানে সবকিছু এভাবে দুইয়ে দুইয়ে মিলে যায় না। শুধু বড় বড় কোটিপতি, পুলিশ, ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা কাকতালীয়ভাবে হিমুদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়

না। হিমুদের জন্য অসম্ভব রূপবতী রুপারা কখনোই অপেক্ষা করে থাকে না। বরং প্রতিটি মানুষের একটি কল্পনার জগৎ থাকে। বাস্তব জীবনের অপ্রাপ্তি, ইচ্ছে, শখ, বাসনা, কামনা এসবকিছু সে কল্পনার সেই অবাস্তব জগতে পূরণ করতে চায়। সেখানে সে তার ইচ্ছেমতো চরিত্র তৈরি করে। যারা ভালো লেখে, তারা সেই জগতটাকে বইয়ের পাতায় নিয়ে আসতে পারে, আর মানুষ বোকার মতো সেই কল্পনার জগতে ঢুকে পড়ে—যেটা অন্যের কামনা বাসনায় ভরপুর। নিজের বাস্তব জগত ফেলে তখন সে অন্যের তৈরি করা সেই মোহের জগতকেই আসল ভেবে বসে। ঢুকে পড়ে এক ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডে।

অশ্লীল, ইরোটিক কোনো মুভি নিয়ে সমালোচনা হলে নির্মাতারা একটা কমন ডায়ালগ দেয়—"ঐ দৃশ্য তো স্ক্রিপ্ট ডিমান্ড ছিল।" শিল্প, আর্ট কপচানো আম জনতা ভাবে আরে তাই তো, স্ক্রিপ্ট তো এরকম একটা দৃশ্য ডিমান্ড করছিল! কিন্তু সেই স্ক্রিপ্ট লিখল কে, কেউ না কেউ তো লিখেছে। ডিমান্ডটা এখানে স্ক্রিপ্টের না, যে লিখেছে তার। সে তার কুৎসিত, কামনা আর লালসায় ভরা যে কল্পনার জগৎ তৈরি করেছে, সেটাকেই "আর্ট" হিসেবে গ্রহণযোগ্য করেছে, নাম দিয়েছে "স্ক্রিপ্ট ডিমান্ড"। আজ আর্ট-শিল্প-সাহিত্য-জীবনমুখী ছবি-বাস্তবঘনিষ্ঠ দৃশ্য বলে যা চলছে, তার সবই কামনা আর বিকারগ্রস্ত কিছু মানুষের তৈরি করা একটি জগতমাত্র। এরকম কামনার দাস যারা আর্ট কপচাত, সম্প্রতি #metoo আন্দোলনের বদৌলতে তাদের অনেকের আর্ট বের হয়ে এসেছে। বাস্তব জগতের নষ্টামি আর অনিন্ত্রিত জীবনটাকেই যে তারা ছবির মাধ্যমে সমাজে হজমযোগ্য করানোর চেষ্টা করেন, #metoo তারই প্রমাণ। ছবিতে তারা স্ক্রিপ্ট ডিমান্ডের নামে যা দেখায়, আসলে এটা তাদেরই জীবন, তাদেরই অনিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রতিচ্ছবি।

এভাবে বিনোদন, ছবি, গান, গল্প, উপন্যাস আমাদেরকে বাস্তবতা থেকে বের করে নিয়ে একটা মোহের জগতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সেখানে আমাদের এই বাস্তব জগতে যে অপ্রাপ্তিগুলো, কামনা বাসনার তাড়না যা আমরা চরিতার্থ করতে পারছি না—তা সহজেই পাওয়া যায়। আর একসময় তা আমাদের এই বাস্তব জগতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আর করণীয় সম্পর্কে গাফেল করে দেয়।

তাই যারা আমাদের জীবনের আদর্শ হবে, যারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলবে, তাদের কর্মপদ্ধতি হতে হবে বাস্তবিক, চারিত্রিকভাবে তাদেরকে হতে হবে অন্যদের জন্য আদর্শ। সেজন্য সকল নবি-রাসূলগণকেই আল্লাহ্ ওহী দানের আগে এমন পরিস্থিতি আর এমন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছেন, যেখানে বাস্তবতার

সবগুলো পাঠ তাঁরা পেয়েছেন। আল্লাহ্ চাইলে নবি রাসূলগণকে অফুরন্ত অলৌকিক ক্ষমতা আর শক্তি দিয়ে সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা হলে, তাঁদের অনুসারিরা মনে করত আল্লাহর রিসালত সেটা সাধারণ মানুষের জন্য না, এটা অবাস্তব, এটা শুধু যাদের বিশেষ ক্ষমতা আছে তাদের জন্য। কিন্তু আমাদের সকল নবি রাসূলই আর দশজনের মতো বাস্তবতার এই জগতেই ছিলেন। তাঁরা রাখাল হয়েছেন, ব্যবসা করেছেন, খাওয়া দাওয়া করছেন, তাঁদের সন্তান ছিল, তাঁদেরও দুঃখ-কষ্ট ছিল, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

তাই যারা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে, যারা স্বপ্ন দেখে ন্যায়-সত্য-ইনসাফের এক সমাজব্যবস্থার, তাদের প্রথমে কল্পনার ঐ জগৎ থেকে বের হতে হবে, আর বাস্তবতার এই জগতে আত্মশুদ্ধি, চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্তরে উন্নীত হতে হবে। ঠিক যেভাবে আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথিরা করেছেন। আর এভাবেই সমাজ পরিবর্তন হয়। অন্যায়, অবিচার সমাজ থেকে দূর হয়। আমাদের সঠিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, এই দুনিয়াতে আমাদের করণীয়—তখনই সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। মোহের জগতে সাময়িক ফ্যান্টাসি হয়তো আছে, কিন্তু সেই জগতে যত বেশি উপরে উঠবেন ততই বিপদ। কারণ মাটির পৃথিবীতে নামার সময় তখন বেশি উপর থেকে আছড়ে পড়তে হয়, ব্যথাটা এতে বেশি—মৃত্যুও হতে পারে।

জান্নাতে কোনোদিন আমাদের মন খারাপ হবে না

কয়েকদিন আগে মাগরিবের পর একটু বের হয়েছি, আচমকা বৃষ্টি। শীতকালে হালকা পাতলা বৃষ্টি হলে তাও কথা ছিল, ইংরেজিতে ক্যাটস এন্ড ডগস বৃষ্টি বলতে যা বোঝায় আরকি। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একটা দোকানে আশ্রয় নিয়েছি। ভালোই লাগছে। শীত পড়েছে, আবার বৃষ্টিও হচ্ছে, অদ্ভুত সুন্দর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছি। নানান কাব্য-সাহিত্য মাথার মধ্যে ঘুরছে। দশ মিনিট, বিশ মিনিট, আধ ঘন্টা..... সময় যাচ্ছে, বৃষ্টি থামছে না। একসময় খেয়াল করলাম এত সুন্দর আবহাওয়া, বৃষ্টি, এসব আর ভালো লাগছে না। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। দেখতে দেখতে এক ঘন্টার বেশি হয়ে গেল, এখনো তুমুল বেগে বৃষ্টি হচ্ছে। এবার বিরক্তি লাগা শুরু করল, কবে বাসায় ফিরতে পারব সেই চিন্তা করছি, সামনে দিয়ে যত রিকশা যাচ্ছে সবাইকে ডাক দিচ্ছি। শেষে এই বৃষ্টির মধ্যে পর্দা ছাড়া এক রিকশায় উঠে কাকভেজা হয়েই বাসায় ফিরেছি। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যেন কোনোমতে বাসায় ফিরতে পারলেই বাঁচি।

দুনিয়ার ব্যাপারটা এমনই। এখানে আপনি সুখ-শান্তির একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেও একটা সময় আপনার কাছে একঘেয়ে মনে হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় এয়ারপোর্টে নেমে এক ভাই বলেছিল, তার ইচ্ছে হচ্ছিল যদি সারাজীবন এখানেই কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু যে-ই না শুনলেন ফ্লাইট লেট কয়েক ঘন্টা, সেই সারাজীবন থাকতে চাওয়ার জায়গাটাও একটা সময় বিরক্তিকর লাগা শুরু করল।

ছোট বাচ্চা দোকানে চকলেটের বাক্স দেখে ভাবে সে যদি দোকানদার হতো, তাহলে সারাদিন চকলেট খেতে থাকত। কিন্তু সেই বাচ্চাটাকে চকলেটের ফ্যাক্টরি কিনে দিলেও সে কয়েকদিন পর সেখানে থাকতে চাইবে না। একটা সময় আপনি যা যা চেয়েছিলেন, এখন তার চেয়ে কয়েকগুণ পাওয়ার পরও একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করবেন, আপনার নতুন কিছু চাই, আরও ভালো কিছু, আরও দামি,

আরও সুন্দর। কারণ এই দুনিয়ার কোনো কিছু এবসুলিউট পারফেক্ট না। মানুষের মনের যে সুকুন বা প্রশান্তির লিমিট, সেটাকে দুনিয়া দিয়ে শতভাগ সন্তুষ্ট করা সম্ভব না। কারণ মানুষের হৃদয়ের সত্যিকারের প্রশান্তি আল্লাহ্ রেখেছেন অন্য কোথাও, আর সেটা হলো জান্নাত। শুধুমাত্র সেখানে গিয়েই শতভাগ প্রশান্তি অর্জন করা সম্ভব।

এই দুনিয়াতেই অনেক মানুষ দেখবেন যাদের সব আছে, তাদের বিরাট আয়োজন দেখলে মনে হবে দুনিয়াতেই তারা জান্নাত বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সেই জান্নাতেও এক সময় তাদের একঘেয়ে লাগে। একটা বই পড়েছিলাম অনেক আগে। বিশাল এক কোটিপতি, ঘর সংসার নেই, শরীরের একটা অংশ অবশ হয়ে গেছে। সে নিজের রুমটাকে এভাবে সাজিয়েছিল যেখানে সুইচ টিপলে যা চায় তা চলে আসে। সে বলত সে নিজের রুমেই জান্নাত বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু একসময় সে নিজের তৈরি জান্নাতেই হতাশ, বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। নিজের তৈরি জান্নাতে সে নিজেই ক্লান্ত। আর এটাই অন্যতম কারণ যে আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই, কারণ আমরা জান্নাতে প্রাসাদ না বানিয়ে দুনিয়াতে প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছি। সত্যিকারের জান্নাতে না গিয়ে, দুনিয়াতে জান্নাত বানানোর ধান্দায় জীবনটা পার করে দিই।

খলিফা সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিক একবার এক তাবিয়িন আলিমের সাথে ছিলেন। তিনি আলিমকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই কেন? কেন কেউ মরতে চাই না?

আলিম উত্তর দিলেন,

> "আমীরুল মুমিনীন! আমরা সবাই দুনিয়াতেই আবাদ করি, আর আখিরাতকে আবাদশূন্য ফেলে রাখি। দুনিয়া বিনির্মাণ করি আর আখিরাতকে করি ধ্বংস। সেজন্যই আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। কারণ কেউ যা নির্মাণ করা হয়েছে সেটা ফেলে যা সে নিজের হাতে ধ্বংস করেছে, সেখানে যেতে চায় না।"

যারা আবু দাহদার মতো জান্নাতে বাগান কিনেছে, যারা উমরের মতো জান্নাতে হীরার বাড়ি কিনেছে, তারা সবসময় উদগ্রীব থাকে কবে এই দুনিয়া ছাড়বে, কবে তাদের নির্মিত প্রাসাদে যাবে, কবে আখিরাতে তাদের অর্জিত সম্পদ ভোগ করবে! বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শেষ সময়ে, তখন তাঁর কষ্ট দেখে স্ত্রী বলে উঠল, আহা! কী কষ্ট আপনার! জবাবে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, কিসের কষ্ট! বরং আজ তো আমার আনন্দ! একটু পরেই আমি আমার রাসূলের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি, আমার সাথীদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুতরাং পুরো দুনিয়া আমাদের অধীনে দিয়ে দেওয়া হলেও সত্যিকারের সুখ পেতে হলে আমাদের এমন কোথাও যেতেই হবে যেখানে দুনিয়ার সীমাবদ্ধতাগুলো নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, মন খারাপ নেই, রোগ বালাই নেই—যেখানে সবকিছু পারফেক্ট—এবসুলিউট পারফেক্ট। আর সেই জায়গা হলো—জান্নাত।

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর ছেলে একদিন জিজ্ঞেস করল, আমরা শান্তি পাব কবে। ইমাম আহমাদ জবাব দিলেন, **"জান্নাতে আমাদের প্রথম কদমটি রাখার পর থেকে।"**

তুমি অবিচল থেকো

কয়েকজন লোক গেল একটা গুহার কাছে। গুহা দেখে সাথে সাথেই একজন বলে ফেলল এখানে সাপ আছে। এটা ফিতরাত, ফিতরাত দিয়েই সে বুঝে ফেলেছে সাপের উপস্থিতি। আরেকজন একটু আশেপাশে দেখল, সে অনেক 'sign' পেল, সেসব 'sign' দেখে সেও মত দিল গুহার ভেতর সাপ আছে। আরেকজন ফিতরাত দিয়েও বুঝল না, sign দেখেও বুঝল না, তাই সে গুহার ভেতর যেতে চাইল। ঢুকেই সে দৌড় দিয়ে পালিয়ে এলো, নিজ চোখে দেখে সে বুঝল আসলেই ভেতরে সাপ আছে। শেষের জন হতভাগা। সে ফিতরাত দিয়েও বুঝল না, sign দেখেও বুঝল না, ভেতরে ঢুকে নিজের চোখে দেখেও বুঝতে চাইল না। ভাবল এ বোধহয় সাপ নয়, হয়তো অন্য কিছু, হয়তো... শেষ পর্যন্ত সে সাপের কামড় খেয়ে তবেই বুঝল আসলেই এটা সাপ ছিল! কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর কিছুই করার নেই।

ইসলামের ব্যাপারগুলো অনেকেই ফিতরাত দিয়ে বুঝে ফেলে। যেমন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকরের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সব ঘোড়াই কোনো না কোনো সময় হোঁচট খায়, সেটা যত ভালো নিখুঁতই হোক না কেন। কিন্তু আবু বকর কখনো হোঁচট খায়নি। অর্থাৎ আবু বকর দ্বীনের ব্যাপারে কখনোই কনফিউজড হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, যার কাছেই আমি দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছি সবাই একটু না একটু দ্বিধায় পড়েছে কিন্তু আবু বকর কোনো দ্বিধায় পড়েনি। জাহিলিয়াতের যুগেও আবু বকর মদকে জায়েয মনে করতেন না, তিনি কোনোদিন মুর্তিপূজাও করেননি। আবু বকরের ফিতরাতই ছিল হক্কের উপর। যখনই তাঁর কাছে ইসলামের কথা বলা হয়েছে তিনি সাথে সাথেই বলেছেন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এরকম আরও ছিলেন আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর কাছে যখন এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল তিনি বলেছিলেন, আমি তো দুই

বছর ধরে এক আল্লাহর ইবাদাত করছি। যখন ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেনি তখনো আবু যর ফিতরাত দিয়ে বুঝেছিলেন আল্লাহ এক এবং কেবল তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। যদিও তখনো নামাযের হুকুম ছিল না কিন্তু তিনি নিজের মতো এক আল্লাহর ইবাদাত করতেন। সুবহানআল্লাহ!

ইসলামের ব্যাপারে বাকিরা মূলত 'sign' দেখে বুঝে গিয়েছিল ইসলামই সত্য এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আবার অনেকেই ইন্টেলেকচুয়ালিটি আর যুক্তিতর্কের উপর ভিত্তি করে বুঝেছিল ইসলামই সত্য। যেমন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু। খন্দকের পর থেকে মূলত তাঁর ভেতর ভাবান্তর তৈরী হচ্ছিল। আমর ইবনুল আস ইসলামের দিকে ঝুঁকছেন বুঝে কুরাইশ নেতারা তাঁর কাছে লোক পাঠাল। আমর ইবনুল আস সেই লোককে জিজ্ঞেস করলেন,

—"বলো তো সত্যের উপর আমরা, না পারসিক ও রোমানরা?"

—সে বলল, "আমরা"। আমর ইবনুল আস বললেন,

—"এ জীবনের পর যদি আর কোনো জীবন না থাকে তাহলে আমাদের এই হক্কের উপর থাকা কী কাজে আসবে? এই দুনিয়াতে হক্কের উপর থেকেও আমরা মিথ্যার উপর যারা আছে তাদের চেয়ে দুনিয়াতে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আছি, আর পরকালেও আমাদের পুরস্কার লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। এ কারণে মুহাম্মাদের শিক্ষা— 'মরণের পর আর একটি জগত হবে, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের ফল লাভ করবে'—এটা অত্যন্ত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।"

এরকম ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও। এবং আমর ইবনুল আস ও খালিদ বিন ওয়ালিদ একসাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আবার অনেকেই ছিলেন যারা ইসলামের বিজয় দেখে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখে, ইসলামের শাসন দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এর মাঝেও দুর্ভাগারা ছিলেন যাদের কোনোকিছুতেই হয়নি। যেমন আবু তালিব। রাসূলের প্রতি তার ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি, ইসলামের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু তারপরও আবু তালিব ঈমান আনতে পারেনি।

এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ এরপর উম্মাহকে বারবার ফিল্টার পেপারে ছেঁকে নিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর কথা শুনে অনেক মুসলিম দ্বীন ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, মিরাজের ঘটনা শুনে অনেকে মুরতাদ

হয়ে গিয়েছিল, মুসায়লামা কাজ্জাবের মতো অনেকে ভন্ড নবি দাবি করা শুরু করেছে, অসংখ্য মুসলিম এসব ভন্ড নবিদের দলে ভিড়েছে, অনেকে যাকাত দিতে অস্বীকার করে দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে। সেই ফিল্টারে ছাঁকন পদ্ধতি কখনও বন্ধ হয়নি, তা এখনো চলছে এবং চলবে। মানুষকে একেক সময় আল্লাহ একেক ফিতনায় ফেলেন আর তার দলের মানুষদের ছেঁকে নেন। ফিতনায় পড়ে প্রথম পর্যায়ে মানুষের ফিতরাত নষ্ট হয়ে যায়, এরপরের ধাপে সে দ্বীনের অজস্র নিদর্শনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়, একসময় নিজের চোখে দেখেও না দেখার ভান করে।

তাই জীবিত কেউ সে যতই ঈমানি জজবা দেখাক না কেন, যতই ভালো কাজে যুক্ত হোক না কেন—সে ফিতনা থেকে মুক্ত নয়। সে হক্কের উপর অটল থাকবে এটা গ্যারান্টেড নয়। তার ফিতরাত, আল্লাহর নিদর্শন দেখে হক্ক চেনার ক্ষমতা অবিচল থাকবে এমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই।

আল্লাহর এই ফিতনায় ফেলে ফিল্টার পেপারে ছেঁকে নেওয়ার পদ্ধতিতে অসংখ্য সিনসেয়ার, ঈমানি জজবার মানুষ ধরা খেয়েছে। অতীতেও, বর্তমানেও আর ভবিষ্যতেও ধরা খাবে।

অধঃপতন, রিদ্দা, ইরজা, খুরুজ—দ্বীনের এই ব্যাপারগুলো কখনোই একদিনে হঠাৎ করে হয়ে যায় না। এগুলো ক্রমান্বয়ে ঘটে। প্রথমে ফিতরাত নষ্ট হয়, এরপর দ্বীনের নিদর্শনগুলোকে পাশ কাটিয়ে যায়, একসময় তারা দেখেও দেখে না। এরপর আল্লাহ কী করেন? আল্লাহ তাদের অন্তরের বক্রতা আরও বাড়িয়ে দেন। অনেকটা কাপড়ে কলমের কালি লাগার মতো। পানি দিয়ে ধুতে গেলে আরও বেড়ে যায়, আরও বেড়ে যায়।

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ বাকারা, ২:১০)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ

"তাদের উপমাঃ যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল; যখন তা তার চতুর্দিক আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারণ করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা আর কিছুই দেখতে পায় না।" (সূরাহ বাকারা, ২:১৭)

সুতরাং হিদায়াত এমন কোনো বিষয় নয় যে নিলামে বসে কিছু বছরের জন্য কিনে নিলে! হিদায়াতের উপর টিকে থাকাকে তোমার পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি মনে করো না যে, পিতা মারা গেলেও আইন অনুযায়ী তুমি তার মালিক হয়ে যাবে। আল্লাহ কুরআনের এক জায়গায় ক্ষমার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, একে আঁকড়ে ধরো। অর্থাৎ এটা এমন কোনো বস্তু নয় যে তোমাকে প্লেটে করে সাজিয়ে সামনে দেওয়া হবে। আঁকড়ে ধরে থাকো—এটা যেকোনো সময় পিছলে যেতে পারে। হিদায়াতও এমন বিষয়। এটা চিরকাল তোমার থাকবে এমন কোনো কথা নেই। এটা ধৈর্য আর তাকওয়ার জিনিস। এখানে দাঁতে দাঁত চেপে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর শক্ত হয়ে জমে থাকা চাই। এখানে এমন সময় আসবে কোনো কিছু তোমার পক্ষে থাকবে না, কেউ তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে না, কেউ তোমাকে রক্ষা করবে না। তুমি অবিচল থেকো। বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।

তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমার এক বন্ধু আছে, যার সাথে ইসলামের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রায়ই কথা হয়। ইসলামের নানা ব্যাপার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে গিয়ে তার একটা ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ্য করি, তার মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আগে থেকেই ফিক্সড ছিলেন, ওনাকে তো আল্লাহ এক্সট্রা ক্ষমতা দিয়েছেন, উনার আগের পরের সব গুনাহ তো মাফ করে দিয়েছেন। সহজ ভাষায় একটা অভিযোগের তীর—একজনকে আল্লাহ রাসূল বানালেন, আরেকজনকে কেন সাধারণ মানুষ? একজনের আগে পরের সবকিছু মাফ করে দিলেন, আরেকজনের জন্য জাহান্নাম রাখলেন কেন? আজকে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে ইহুদিদের কথা মনে পড়ল। তারা কিন্তু জানত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই আল্লাহর প্রেরিত দূত—তাঁর আনীত ইসলামই সত্য। কিন্তু তারপরও তারা অস্বীকার করেছিল—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেয়নি। কারণ তারাও এই অভিযোগটা করেছিল—কেন আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করলেন না, কেন আরব কুরাইশদের থেকে রাসূল বানালেন! কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের মধ্য থেকে না হয়ে কুরাইশদের থেকে হলো! ব্যস! এই অজুহাতে তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, সত্যকে অস্বীকার করল।

কেন আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বানালেন? কেন ওনাকেই আল্লাহ বাছাই করলেন? এই প্রশ্নগুলো আসে কারণ আমাদের এই হলিউড প্রজন্মের মানুষের ধারণা রাসূল, নবি, আল্লাহর আউলিয়া ব্যাপারগুলো তাদের দেখা আজগুবি হলিউড মুভির মতো কিছু একটা। সেখানে গল্পের নায়কের মতো নবি, রাসূলের ব্যাপারগুলোকেও এরা ফ্যান্টাসি মনে করে। সুপারম্যান উড়ে বেড়াচ্ছে, এক্স-ম্যানদের অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা, বিশাল চাকার হোন্ডায় চড়ে ছুটে

বেড়াচ্ছে ব্যাটম্যান, কেউ তাকে ধরতে পারছে না। কিংবা দুনিয়ায় এসে ভিলেনের সাথে যুদ্ধ করছে বজ্রদেবতা, এলিয়েন, আরও কত হাবিজাবি। এদের কাছে নবি, রাসূলের ব্যাপারগুলোও তাই অনেকটা এরকম সিনারিও। তাদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলেই তাঁরা ওসব করে যেতে পেরেছে! ভাবটা এমন যেন আমাকে দিলে আমিও তো পারতাম! কিন্তু বাস্তবতা আমাদের এই হলিউড প্রজন্মের মতো এত ফ্যান্টাসিতে ভরা ছিল না। আমাদের নবি-রাসূল, আউলিয়ারাও মানুষই ছিলেন, তারা কেউ এলিয়েন ছিলেন না, সবসময় জায়নামাযে চড়ে উড়ে বেড়াতেন না, শুধু অলৌকিকতা দেখিয়ে বেড়াতেন না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন মানুষই ছিলেন। কেমন মানুষ?

তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । যিনি আগে পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়ার পরও আল্লাহর কাছে দিনে শতবার তাওবা করতেন। যিনি মাঝরাতে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন, এই দাঁড়ানো এত দীর্ঘ হতো যে পা ফুলে যেত। যখন ওনার স্ত্রী প্রশ্ন করত আপনার এত কষ্ট করার কী দরকার, আপনার তো আগে পরের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে! তিনি বিনয়ের সাথে উত্তর দিতেন, আমি কি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হবো না?

তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যিনি সন্তানের মৃত্যুতে কেঁদেছেন, স্ত্রীদের সাথে অভিমান করে বাসা থেকে বের হয়ে গেছেন। যিনি নিজের ছেঁড়া জামা নিজের হাতে সেলাই করেছেন, যিনি যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া সঙ্গীদের মাথা কোলে নিয়ে অঝোরে কেঁদেছেন, নিজে কবরে নেমে তাদের কবরস্থ করেছেন। যিনি কিশোরী স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন, প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুতে ব্যথিত হয়েছেন, মাঝরাতে তাঁর কবরের পাশে গিয়ে শিশুদের মতো কেঁদেছেন। তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ, তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

দিনের পর দিন যার বাড়িতে চুলায় আগুন জ্বলত না। পানি আর খেজুর খেয়ে মাসের পর মাস চলে যেত। তিনি বসে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের সাথে। তাঁদের সামনে পড়ে ছিল একটা খেজুর, পচা খেজুর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা তুলে নিলেন, পচা অংশটা পরিষ্কার করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমরকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি খাবেন কি না। আবুদল্লাহ ইবনু উমর নারাজি হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আব্দুল্লাহ! তোমার কাছে এটা খাওয়া না খাওয়ার অপশন, আর আজ চারদিন হলো তোমার রাসূলের পেটে কিছু পড়েনি। তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আবু আইয়ুব আল আনসারির বাড়িতে দাওয়াত খেতে বসে একটা রুটির উপর এক টুকরো গোশত দিয়ে আবু আইয়ুবকে বললেন, যাও এটা আমার কন্যা ফাতিমাকে একটু দিয়ে এসো, আমার মেয়েটা এমন খাবার অনেক দিন খায়নি। ক্ষুধার্ত সাহাবি এসে ক্ষুধার জ্বালায় নিজের পেটে পাথর দেখালে তিনি নিজের জামা তুলে দেখালেন তাঁর পেটে এর চেয়েও বেশি পাথর বাঁধা। তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যিনি এক তরকারীর বেশি দিয়ে আহার করতেন না। যার একটার বেশি জামা ছিল না, যার ঘর ছিল মাটির, বালিশ ছিল খেজুরের ছোবলা। আল্লাহর কসম! তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

যিনি বদরের প্রান্তরে অল্প কিছু আল্লাহর বান্দা নিয়ে বিশাল শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়েছেন, মুসলিমদের বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে কেঁদেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ ওনাকে সুসংবাদ না দেন, তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যিনি তাইফের প্রান্তরে প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়েও আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে বলেছেন, হে আল্লাহ, তারা অবুঝ, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। যিনি নিজের পিতামাতার জন্য দুআ করার অনুমতি পাননি। যিনি মৃত্যুর সময়ও চেতন অবচেতন অবস্থায় বারবার আওড়িয়ে যাচ্ছিলেন, উম্মাতি উম্মাতি উম্মাতি...

যার আত্মীয়স্বজন গোত্রীয় লোকেরাই তাঁকে হত্যার জন্য ওঠেপড়ে লেগেছে। যিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন সবকিছু ছেড়ে গেছেন। স্বজাতির হাত থেকে বাঁচতে পাহাড়ে, গুহায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। মুশরিকরা যখন একের পর এক ক্ষমতা, সম্পদ, নারীর লোভ দেখাচ্ছিল তিনি তাদের বলেছিলেন, আমার এক হাতে চন্দ্র আর আরেক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এই সত্য প্রচার থেকে বিরত হবো না। হয় এতে বিজয় লাভ করব নয়তো এই পথেই ধ্বংস হয়ে যাব। তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

যার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে অকাতরে। যুদ্ধের আগে কিছুই দিতে না পেরে এক মা তার বাচ্চাকে রাসূলের সামনে তুলে দিয়ে বলছিলেন, যখন আপনাকে শত্রুরা আঘাত করবে আপনি আমার এই সন্তানকে ঢাল হিসেবে ধরবেন, আমার সন্তান ছিন্নভিন্ন হবে কিন্তু অন্তত আমার রাসূল শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা পাবে। আবু আইয়ুব আল আনসারির বাড়িতে যেদিন তিনি মেহমান হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচ তলায় আর তারা স্বামী-স্ত্রী উপর তলায়, এটা বেয়াদবি হয়ে গেল কি না এই চিন্তায় সারারাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন।

যার জন্য সাহাবিরা আপন পিতা-ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধলব্ধ গনীমাহ না পেয়ে মন খারাপ করা আনসারদের যখন তিনি বললেন, এটাই কি তোমাদের জন্য উত্তম নয় যে তারা দুনিয়া পেল আর তোমরা তোমাদের রাসূলকে পেলে— তখন চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। যিনি খোদ অমুসলিমদের কাছেও আস্থার প্রতীক ছিলেন। অমুসলিমরা তাঁর কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য আসত। তারা জানত মুহাম্মাদ আর যাই হোক অবিচার করবে না। তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যিনি আমাদের জন্য হাশরের মাঠে আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবেন, আমাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন।

আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা এই রাসূলের প্রতি আমাদের হক্ব আদায় করতে পারিনি। তার ইজ্জতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি।

আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

জীবন থেমে থাকে না, পাল্টে যায়।

ভার্সিটির হলে থাকার সময় খুব হিসেব করে টাকা খরচ করতাম। মাসের প্রথম দিকে হাজার তিনেক টাকা আসত আমার কাছে, সেটাই পুরো মাসের সম্বল। কিন্তু দেখা যেত মাস শেষে সেখান থেকেও কিছু বেঁচে গেছে। আমার বন্ধুরা বলত আমার উপর আল্লাহর রহমত আছে, সেজন্য সবকিছুতে বরকত হয়।

টাকা বাঁচানোর জন্য হলে আমরা না খেয়ে থাকতাম এমন কিন্তু না। সকাল বিকেল নাস্তা, দুপুরে-রাতে ভাত সবই চলত। খাবারের দাম কম তা ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের হিসেবি খরচে একটা ভিন্ন জীবন যাপন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। ছোট্ট এক টুকরো গরুর মাংস, ভাত, ডাল এসব মিলে ৪০ টাকা মতো লাগত। এটাই ছিল আমাদের জন্য হল ডাইনিং এ সবচেয়ে দামি খাবার। যারা এটা খেত তাদের পকেটের অবস্থা ভালো বলে আমরা ধরে নিতাম। নীলক্ষেত মামা হোটেলে আমরা মাঝে মাঝে খেতে যেতাম। দুইজন মিলে যেতাম, মুরগির ঝাল ফ্রাই বলে একটা মেন্যু পাওয়া যায় সেখানে, চার পিস মুরগির মাংস থাকত, দুই জন মিলে খেতাম। বিল আসত একশো টাকা, ফিফটি ফিফটি বিল দিতাম দুইজন মিলে। মাঝে মাঝে এরকম ভুরিভোজটাই ছিল আমাদের জন্য বিশাল কিছু। হল থেকে শাহবাগ, নীলক্ষেত— রিকশায় ওঠার কথা আমরা চিন্তাও করতাম না।

স্টুডেন্ট লাইফের শেষ দিকে আমি একটা চাকরি শুরু করি। মাস শেষে যে টাকা আসত সেটা বর্তমান বাজারে আহামরি কিছু না, কিন্তু হলে যে জীবন যাপন পদ্ধতিতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম—সেখানে এই এমাউন্ট রীতিমত 'এত টাকা দিয়ে করব কী'—এরকম মনে হতো! এরপর আস্তে আস্তে জীবন যাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসা শুরু করল। দেখা যেত প্রায়ই বাইরে খেতে যাচ্ছি, সকালের কলা-পাউরুটির জায়গায় এটা ওটা খাচ্ছি, বন্ধুদের ট্রিট দিচ্ছি, পাঁচ টাকা দামের চায়ের জায়গায় প্রতিদিনই পনেরো টাকায় কফি খাচ্ছি। শাহবাগ, পলাশী, নীলক্ষেত—রিকশা ছাড়া যাচ্ছি না। যে তিন হাজার টাকা থেকে মাসে কিছু বেঁচে

যেত, সেখানে এখন মাসের খরচ ডাবল হয়ে গেল। অথচ আমি আমি-ই আছি, এখনো হলেই থাকি। শুধু একটি জীবন যাপন পদ্ধতি থেকে আরেকটি পদ্ধতিতে পদার্পণ আমাদের জীবনের চাকা অনেক সময় ঘুরে যায়।

অনেকের সাথে প্রায়ই আলোচনা হয় দ্বীন বনাম দুনিয়া নিয়ে। তারা প্রশ্ন করে ইসলাম কি আমাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে দিতে বলে, আমরা কী দুনিয়ার কিছুই করব না, সাহাবিরা তো এটা করেছেন, ওটা করেছেন। অনেক তর্ক হতো। কিন্তু এক কথায় বললে, সাহাবিরা দুনিয়া কামাই করেছেন সত্য, কিন্তু তারা কখনও জীবন যাপনের যে নববি পদ্ধতি—সেটা পরিবর্তন করেননি। সেজন্য তাদের কামাইকৃত দুনিয়া তাদের দ্বীনের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। সেই দুনিয়া তারা দুনিয়াতেই ছুড়ে মেরেছেন।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"আপনি বলুনঃ আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে হারাম করেছে? আপনি বলুনঃ এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা বোঝে।" (সূরাহ আরাফ, ৭:৩২)

আল্লাহ্ আরও বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে" (সূরাহ আল ইসরা, ১৭:২৯)

এই আয়াতগুলো যখন নাযিল হয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীরা একদিন নবিজিকে ঘিরে ধরল, তাদের ভরণ-পোষণের খরচ বাড়িয়ে দিতে হবে। তাঁরা মনে করলেন ইসলাম এবং মুসলিমরা যেহেতু এখন ভালো অবস্থায়

আছে, ধনসম্পদ বাড়ছে, এখন আর আগের সেই জীবন যাপন পদ্ধতিতে কিছুটা ঢিল দেওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহ বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"হে নবি! আপনি আপনার সহধর্মিনীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরাহ্ আহযাব, ৩৩:২৮-২৯)

আল্লাহর নবি ছিলেন উম্মাতের জন্য আদর্শ, ঠিক তেমনি উম্মুল মুমিনীনরাও। তাঁরা যদি দুনিয়ার ভোগ বিলাসের জীবন গ্রহণ করতেন তাহলে সেটা উম্মাতের জন্য আদর্শ হিসেবে গড়ে উঠত। তাই যদিও ইসলাম ভালো অবস্থায় ছিল, কিন্তু আল্লাহর নবি, সাহাবিরা কখনোই তাদের সেই জীবন যাপন পদ্ধতিতে ঢিল দেননি। তাঁরা আখিরাতের জন্য বেঁচেছেন, ইসলামের খারাপ সময়েও, ইসলামের ভালো সময়েও।

আমাদের কারও জীবনই থেমে থাকে না। চার হাজার টাকা দিয়ে শার্ট কেনে কেউ, আবার দেড়শো টাকা দামের শার্ট কিনেও কেউ দিব্যি চলছে। কারও মাসের বাজার খরচ যায় অন্য কারও দুই তিন মাসের বেতনের সমান। কেউ রেস্টুরেন্টে গিয়ে হাজার খানেক বিল দিয়ে খায়, আর কেউ টং দোকানে চায়ে চুবিয়ে পাউরুটি খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। মাস শেষে তাই দুই লাখ টাকা বেতন পাওয়া মানুষটার জীবনটাও কেটে যায়, আবার মসজিদের মুয়াজ্জিন যার বেতন সাড়ে তিন হাজার টাকা, সেও বউ-বাচ্চা পরিবার নিয়ে দিব্যি সংসার করে যাচ্ছে।

বিয়ের সময়ও তাই পাত্র-পাত্রীর ফ্যামিলি স্ট্যাটাস মেইন্টেইন করার ব্যাপারটাতে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আবেগের চেয়ে বাস্তবতা বেশি জরুরি। দেখা গেল মেয়ে যে ফ্যামিলিতে বড় হয়েছে সেখানে সে বিলাসী জীবন যাপন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত, কিন্তু ছেলের ফ্যামিলিতে এসে সে ভিন্ন এক জীবন যাপন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে পারছে না। জীবন যাত্রার মান উপরে ওঠাতে স্বামীকে চাপ দিচ্ছে, পাল্লা দিতে গিয়ে

স্বামীও হিমশিম খাচ্ছে। একসময় এভাবেই অনেককেই দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে হয়। এভাবে অনেকেই ঝরে যায়...

বাবা-মায়েদেরও উচিত ছোট থেকে ছেলে-মেয়েদেরকে বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত না করা। **যা চায় তাই পায়**—এমন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে সময় খারাপ গেলে কিংবা টাকা পয়সায় টান পড়লে হুট করে বাচ্চাদের এই জীবন পদ্ধতিতে লাগাম টানা যায় না। ছোটবেলা থেকেই বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেই মান ধরে রাখতে গিয়ে অনেক সময় পরিবারের কর্তাকে নানান অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে হয়।

সবচেয়ে উত্তম জীবন পদ্ধতি হলো সুন্নাহ উপায়ে জীবন যাপন করা। সবচেয়ে সেফ সাইড। দুনিয়া আখিরাত সব দিকেই উন্নতি করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

লকডাউন

নবি-রাসূলদের মধ্যেও অনেককে তাঁদের জীবনের একটা অংশ লকডাউন কিংবা বন্দি অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিসসালাম কারাগারে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পরিবার, সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে তিন বছর অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।

তবে লকডাউনের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন ইউনুস আলাইহিসসালাম। তাঁর লকডাউন ছিল তিমি মাছের পেটে, টানা ৪০ দিন। এই লকডাউন কতটা ভয়াবহ চিন্তা করুন,

—জায়গাটা বিশাল এক মাছের পেটের ভেতর।

—দুনিয়ার কারও সাধ্য নেই তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করবে কিংবা ত্রাণ পাঠাবে।

—কোনো খাবার নেই।

—এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করার কোনো উপায় নেই।

—তীব্র অন্ধকার।

—পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, একেবারে একা।

—আর সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল অনিশ্চয়তা। সে সময়টাতে আমরা হয়তো সর্বোচ্চ এটাই চিন্তা করতে পারতাম যে মৃত্যু কখন হবে, কীভাবে হবে!

কিন্তু ইউনুস আলাইহিসসালাম এই সময়টাতে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আশা হারাননি, আতঙ্কিত হননি। তিনি একটি অসাধারণ দুআ জপতে থাকলেন,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

একজন আলিম এই দুআর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইউনুস আলাইহিসসালাম এখানে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* না বলে *'লা ইলাহা ইল্লা আনতা'* বললেন কেন? আরবিতে আনতা ব্যবহৃত হয় খুব কাছে, নিকটে কিছু বোঝাতে। আমরা যখন বলি ও আল্লাহ, ইয়া রব—তখন সাধারণভাবে বোঝায়। কিন্তু যখন বলি *ইল্লা আনতা* — তার মানে আমি এমন কাউকে সম্বোধন করছি, যিনি আমার নিকটে, আমার কাছেই কোথাও। ইউনুস আলাইহিসসালাম তাঁর দুআতে এমনভাবে আল্লাহকে ডেকেছেন, যেন তিনি খুব কাছেই আছেন—তাই তিনি বলেছেন *'লা ইলাহা ইল্লা আনতা'*। আমরা সবাই জানি আল্লাহর আমাদের নিকটেই আছেন। ইউনুস আলাইহিসসালাম তাওহিদের এই জ্ঞানকে তাঁর দুআয় এপ্লাই করে দেখিয়েছেন।

এই দুআর পর অবিশ্বাস্য এক জায়াগা থেকে, যেখানে দুনিয়ার সমস্ত সাহায্য ব্যর্থ, যেখানে কোনো আশা নেই, বেঁচে থাকার উপায় নেই—সেখান থেকে আল্লাহ ইউনুস আলাইহিসসালামকে মুক্ত করেছিলেন।

সেই দুআ আমাদের জন্য আল্লাহ কুরআনে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। বালা-মসিবত, দুঃখ-কষ্ট, এমন পরিস্থিতি, যেখান থেকে দুনিয়ার কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, যেখানে কোনো আশা নেই, যেখানে কোনো সঙ্গী নেই, এমন পরিস্থিতিতে করণীয় কী হবে—সেটার প্রেসক্রিপশন আল্লাহ অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছেন।

—নিজেদের গুনাহর জন্য তাওবা করা

—সবর করা, আশা না হারানো।

—কায়মনোবাক্যে শুধু এক আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া, ইয়াকীনের সাথে।

করোনার দিনে সারা দুনিয়া লকডাউনে চলে গেছে। কিন্তু আমাদের লকডাউন তো আলহামদুলিল্লাহ ইউনুস আলাইহিসসালাম এর চেয়ে ভয়াবহ নয়। আল্লাহ যদি ইউনুস আলাইহিসসালামকে তিমি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করতে পারেন, তবে আমাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতেও পারেন। কিন্তু আমাদের চাওয়া, আমাদের আশা, আমাদের আকুতি হওয়া চাই ইউনুস আলাইহিসসালাম এর মতো।

বিপ্লবের মশাল

আজ থেকে চার বছর আগে Colin Kaepernick নামের একজন কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় আমেরিকান ন্যাশনাল ফুটবল লীগের (NFL) ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন হাঁটু গেড়ে বসে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সে বলেছিল, যে দেশ কালো মানুষের প্রতি অত্যাচার করে, বর্ণবাদী আচরণ করে—সে দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সম্মানে সে দাঁড়াতে পারবে না। এরপর তাকে অনেক চড়াই উতরাই পার হতে হয়। তাকে ক্লাব ছাড়তে হয়, এরপর আর কোনো ক্লাব তাকে দলে নেয়নি। NFL এ হাঁটু গেড়ে প্রতিবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়; কেউ এরকম করলে জরিমানার আইন করা হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প Colin Kaepernick এর কড়া সমালোচনা করেন। এদেশ ভালো না লাগলে তার জন্য উপযুক্ত, এমন কোনো দেশ খুঁজে নিতে বলা হয়। কিন্তু এরপরও Colin Kaepernick দমে যায়নি। ঐ ঘটনার পর কোনো দল তাকে না নেওয়ায় সে আদালতে মামলা করে।

চার বছর পর, Colin Kaepernick এর সেই হাঁটু গেড়ে প্রতিবাদ স্টাইল সারা বিশ্বে এখন ট্রেন্ড হয়ে গেছে। সিলেব্রেটি থেকে নানান দেশের রাজনৈতিক নেতা, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ক্রিকেট, ফুটবল সব খেলা শুরুর আগে খেলোয়াড়রা হাঁটু গেড়ে #BlackLivesMatter এর সাথে সংহতি জানাচ্ছে। কিন্তু 'ট্রেন্ড' হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত এই কাজটির জন্য একজন মানুষকে অনেক মাশুল গুণতে হয়েছে। অনেক কিছু স্যাকরিফাইস করতে হয়েছে। একা স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা খুলে ১৪০০ বছর আগে ফিরে দেখুন, এমনটাই হয়েছিল। আজকে আমরা ধর্ম হিসেবে যে ইসলামকে জানি, সত্যি বলতে আমাদের কারোরই এর জন্য কোনো এফোর্ট দিতে হয়নি। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা প্রায় সবাই-ই এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কিন্তু যে মানুষটা প্রথম এই দ্বীনের বার্তা নিয়ে আসেন, তাঁর জন্য এবং তাঁর সাথীদের জন্য এটা মোটেই সহজ কিছু ছিল না। এই

দ্বীনের জন্য তাদেরকে জীবন দিতে হয়েছে, অত্যাচারিত হতে হয়েছে, বাড়িঘর ছাড়তে হয়েছে, ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে থাকতে হয়েছে, নিজের আপনজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে, কত শত জমিন নিজেদের রক্তে রাঙিয়ে, কত প্রিয়জন, প্রিয় বস্তু বিসর্জন দিয়ে আজকের এই দ্বীন ইসলামের ভিত গড়ে উঠেছে!

এজন্য প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা, মানে সাহাবিরা ইসলামে অন্য মর্যাদায় সমাসীন। তাদের মধ্য থেকে ১০ জনকে দুনিয়াতে থাকতেই অগ্রীম জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ঘর, নিজের শহর মক্কা ছেড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ দিনগুলো আনসারদের সাথে মদিনায় ছিলেন, এমনকি মৃত্যুর সময় বারবার তিনি সাহাবিদের বলেছেন আনসারদের সাথে যেন ভালো আচরণ করা হয়। কেন? কারণ এই আনসাররাই ছিলেন দ্বীনের আনসার, এই দ্বীন যখন শুরুর সময়ে অত্যাচারিত, নির্যাতিত তখন এই আনসাররাই তাকে আশ্রয় দিয়েছে, এই দ্বীনের হয়ে যুদ্ধ করেছে—কোনো ধরনের দুনিয়াবি স্বার্থ ছাড়াই—শুধুমাত্র আখিরাতের আশায়। যে কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের কদর করেছেন, তাদের সাথেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন। কারণ এরাই সেই মানুষগুলো যারা অনেক ত্যাগ, দুঃখ-বেদনা সহ্য করে বিপ্লবের মশাল হাতে নিয়েছিলেন, যখন অন্যরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

কোনো কিছু যখন লোকপ্রিয়তা লাভ করে, মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, তখন তার পক্ষে দাঁড়ানো সহজ, মানুষ দলে দলে তার পক্ষ নেয়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।" (সূরাহ আন নাসর, ১১০: ১-২)

আমেরিকায় জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর এখন সবাই কালোদের পক্ষে, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে। যে NFL হাঁটু গেড়ে প্রতিবাদ করা নিষিদ্ধ করেছিল তারা ক্ষমা চেয়ে বলেছে, এটা তাদের ভুল ছিল। চলমান এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা জানিয়েছে ইংলিশ ফুটবল ক্লাব আর্সেনাল, অথচ তাদের একজন খেলোয়াড় মেসুত ওজিল যখন উইঘুরদের উপর চীনের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল, আর্সেনাল সাথে সাথে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, এটা ওজিলের

ব্যক্তিগত মত, এর সাথে ক্লাবের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ উইঘুরদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা কিংবা #uighurLivesMatter বিশ্বব্যাপী 'ট্রেন্ড' হতে পারেনি। এটা স্রোতের বিপরীতের ইস্যু। এর পক্ষে দাঁড়াতে গেলে মূল্য দিতে হয়। ভারতের দিল্লীতে কয়দিন আগে দিনে দুপুরে দল বেঁধে মুসলিম কাউকে দেখলেই পিটিয়ে মারার যে উৎসব চলেছে, তার হৃদয়স্পর্শী সব ছবি মিডিয়াতে আসার পরও ভারতের সিলেব্রেটিরা মুখে কুলুপ এঁটে ছিল। সেই তারা এখন জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর খুব বর্ণবাদবিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধীতার সবক দিচ্ছে।

একই কথা দ্বীনের ক্ষেত্রেও। এখানেও সবাই ট্রেন্ডি ইসলামটাই চায়। যেখানে সবাই খুশি থাকবে। 'মানুষ কী বলবে'—এই কনসার্ণ থাকবে। দ্বীনের যে বিষয়গুলো নিজের প্রবৃত্তি, সমাজ, 'মানুষ কী বলবে'—এসব ফিল্টারে আটকে যাচ্ছে—সেখানে 'ইসলাম এত কঠিন না' মর্মে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে চলবে।

ট্রেন্ড ফলো করার মধ্যে কোনো বিশেষ কৃতিত্ব নেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে, স্রোত আপনাতেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এটা সবাই পারে। কিন্তু সত্যের পক্ষে সিনা টান করে দাঁড়ানো, কঠিন স্রোতের বিপরীতে উল্টো দিকে যাত্রা করা, সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করা, এটা সবাই পারে না। কারণ এটা করতে গেলে কিছু মূল্য দিতে হয়। "Comfort Zone" থেকে বের হতে হয়। এই স্যাকরিফাইসটুকু কিছু মানুষ করে বলেই পৃথিবীতে সত্য আজও টিকে আছে, সত্যের মশাল আজও জ্বলছে, কিয়ামত পর্যন্ত জ্বলবে।

রিদ্দার মিছিল

একটা অ্যাপ ইন্সটল করার সময় টার্মস এন্ড কন্ডিশন থাকে, সেখানে 'I agree' দিলেই কেবল আপনাকে অ্যাপটি ইন্সটল করার অনুমতি দেওয়া হবে। অন্যথায় আপনি যেই হোন না কেন, অ্যাপটি আপনাকে প্রবেশাধিকার দেবে না। একটা কোম্পানীতে জয়েন করার সময়ও চুক্তিপত্রে টার্মস এন্ড কন্ডিশন থাকে, যার কোনোটি অমান্য করলে কতৃপক্ষ্য আপনাকে চাকরি থেকে বের করে দেওয়ার এখতিয়ার রাখে।

এই পৃথিবী আর এর বিশালত্বের তুলনায় এই অতি নগণ্য মানুষের বানানো এই অ্যাপ, একটা চাকরি, এসব অতি সামান্য বিষয়। অথচ সেখানেও কত কড়া নিয়ম দেখুন। তাই এই পুরো পৃথিবী, এর মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুর যিনি স্রষ্টা, তার মনোনীত যে ধর্ম বা দ্বীন, সেটা এত ঠুনকো হবে, এতটা আশা করাটা বোকামি। এখানেও টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে, যেগুলো না মানলে কারও সেই দ্বীন বা ধর্মের গণ্ডীতে থাকার সুযোগ নেই। এই ধর্ম বা দ্বীন স্রেফ কিছু আচার অনুষ্ঠান, স্রষ্টারে তো মানি, কিছু জায়গায় ধর্ম মানি, কিছু জায়গায় আমি ধর্মের চেয়ে বেশি বুঝি—এভাবে জগাখিচুড়ি পাকানোর সুযোগ নেই। এই ধর্ম কোনো মানুষ বানায়নি, যদি কারো বিশ্বাস হয় মানুষ বানিয়েছে, তাহলে তার বেসিকে সমস্যা আছে, আগে বেসিক ঠিক করা জরুরি। বেসিকটা হলো একজন মানুষ জন্ম নিয়েছে, তার একজন স্রষ্টা আছেন, সেই মানুষটা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টাতে কীভাবে জীবনযাপন করবে তার একটা প্রেসক্রিপশন আছে—আর এই প্রেসক্রিপশনটাই ধর্ম বা দ্বীন। এই ধর্ম পায়খানায় কোন সাইডে ভর দিয়ে বসবেন, পানি কীভাবে পান করবেন, বেচাকেনা কীভাবে করবেন, স্ত্রীর সাথে সহবাস কীভাবে করবেন সেখান থেকে শুরু করে একটা রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, সবকিছু একেবারে খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছে, একেবারে পাই পাই করে। কোনো অস্পষ্টতা নেই। যে কেউ চাইলেই বুঝতে পারবে, এটা কোনো রকেট সাইন্স না। আর এই সবকিছুই সেই ধর্মের প্রিন্সিপল, টার্মস এন্ড কন্ডিশন, এগুলো না মানলে

কিংবা এসব মেনে দুনিয়াতে চলা যায় নাকি, ধর্ম এই যুগে চলে নাকি, এমন বেশি বুঝলে সেই ধর্মের গণ্ডীতে থাকার সুযোগ নেই। তখন তাকে মুরতাদ বলা হয়।

আমাদের চারপাশে এমন অনেকেই আছে, যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছে, নামও মুসলিম, কিন্তু তারা মুরতাদ। মানে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। দিনে তিনবেলা চেতনা খেতে খেতে এদের বিশ্বাসে আর ধর্ম বা দ্বীন নেই।

একটা মানুষ হুট করে একদিন ঘুম থেকে উঠেই মুরতাদ হয়ে যায় না। মুরতাদ হওয়া, দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া, এটা একটা প্রসেস। আর এই প্রসেসের প্রথম ধাপ হলো কুফরি বা রিদ্দার সাথে যুক্ত কাজগুলোর প্রতি সফট কর্ণার তৈরি হওয়া। এটা আমি নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। ভার্সিটিতে আমি এমনটা দেখেছি। মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা ছেলে, ভার্সিটিতে এসে সঙ্গদোষে, দুই চার পাতা হুমায়ুন আজাদ, আরজ আলি পড়ে একটু একটু করে রিদ্দার সাথে যুক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সফট কর্নার তৈরি হয়েছে। থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের দিকে এমন সব কথা বলা শুরু করল, শরিয়া প্রদত্ত ওজর না থাকলে তাকে আর মুসলিম বলার সুযোগ নেই।

এন্ডোর্স করার কালচারটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। কোনো মুভি সিনেমা হলে রিলিজ করার আগে প্রিমিয়ার শো'র আয়োজন করা হয়। যেখানে অন্যান্য অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক এদেরকে দাওয়াত দিয়ে ছবিটা দেখানো হয়। ছবির সাথে যুক্ত নয় এমন অভিনেতা অভিনেত্রীরা এসে ছবিটা দেখে, বাইরে সাংবাদিকরা অপেক্ষা করে, তারা ছবি দেখে এসে বলে, অসাধারণ ছবি, দুর্দান্ত অভিনয়, সবাইকে ছবিটা হলে গিয়ে দেখার অনুরোধ করছি। ইদানীং সেই এন্ডোর্স করার জনপ্রিয় মাধ্যম হলো সোশ্যাল মিডিয়া। এই এন্ডোর্স করার মাকসাদ হলো একজনের কাজে আরেকজন সহযোগিতা করা। যদিও কাজটা সে নিজে করছে না!

ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দেখলাম একজন লিখেছে, গানের সাথে হালকা ধাঁচের মিউজিক থাকলে আল্লাহ সেটা গুনাহ হিসেবে ধরবেন না। নন-প্র্যাকটিসিং কেউ নয়, তার ফেসবুক একটিভিটি দেখে প্র্যাকটিসিং মনে হলো। আরও বলছে, যদিও এর পক্ষে কোনো দলিল নেই, কিন্তু আল্লাহ এটাকে গুনাহ হিসেবে ধরবেন না, এই বিষয়ে তার বিশ্বাস আছে।

উমর ইবনু আবদুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, লুত আলাইহিসসালাম এর কওমের কথা কুরআনে না থাকলে তিনি বিশ্বাসই করতেন না যে, মানুষ সমকামী হতে পারে! সুবহানআল্লাহ! অথচ সেই অবিশ্বাস্য বিষয়টা বিশ্বে স্বাভাবিক হয়ে গেছে, স্বাভাবিক হয়ে গেছে খোদ অনেক মুসলিম নামধারীর কাছে। তারা নিজেরা

বিশ্বাস করছে এবং চাচ্ছে মুসলিমরাও বিশ্বাস করুক যে, সমকামীতা একটা অধিকার, এটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি অনেকে নিজেরা সমকামী নয়, কিন্তু এর পক্ষে গলা উঁচু করছে। কেন জানেন? কারণ এটা যে পাপ, এই বোধটুকু তাদের অন্তর থেকে মুছে গেছে। এবং এটা একদিনে হয়নি, এটা একটা প্রসেস।

লুত আলাইহিসসালাম এর স্ত্রী নিজে সমকামী ছিল না, কিন্তু সে সমকামীদের এনডোর্স করত, সহযোগিতা করত। তার কী পরিণিতি হয়েছিল, তা কুরআনে স্পষ্ট করে বর্ণিত আছে।

আমরা অনেক সময় জেনে কিংবা না জেনে কুফরি এসব বিষয়ের প্রতি সফট কর্ণার তৈরি করার কাজটা করি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজে নানান অপকর্ম এনডোর্স করি। অশ্লীলতা, কুফরি, শিরক নানান কিছুর প্রচারণা চালাই, নিজেরাই জানি না, এসব একটু একটু করে আমাদেরকে, সাথে অন্যদেরকেও রিদ্দা বা দ্বীন ত্যাগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

শেষ জামানার একটা নিদর্শন হলো রিদ্দা বা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া মহামারি আকার ধারণ করবে। মানুষ জানতেও পারবে না সে আর মুসলিম নেই, অথচ সে নিজেকে মুসলিম দাবি করবে। আমাদের চারপাশেই এরা ঘুরবে, ফিরবে, একই টেবিলে বসে খাবে, আমাদের মেয়ে, বোনেদের সাথে এদের বিয়ে হবে, অথচ এরা মুসলিম নয়।

আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

> "নিশ্চয় তোমাদের পরবর্তী যুগে ফিতনা হবে গভীর অন্ধকার রাতের ন্যায়। মানুষ সে সময় সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে।" (মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ: ১৩/৩৮৫, যুহদ লি ইমাম আহমাদ: ১৯৯)

এজন্য আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার এই দুআটা করতেন, "ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুব সাব্বিত ক্বালবি আ'লা দ্বীনিক- হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো।"

আল্লাহ যেন এই ফিতনার জামানায়, আমাদেরকে মুরতাদের মিছিলে শামিল হওয়া থেকে হিফাযত করেন। দিনশেষে যে ঈমানটুকু হারিয়ে গেলে, সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যাবে, সেই ঈমানটুকু নিয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার তাওফিক দেন। আমীন।

এক টুকরো গরুর মাংস

আজ এক ভাইয়ের কাছে একটা ঘটনা শুনলাম। একবার তিনি তার বাসায় এক ভাইয়ের সাথে খাচ্ছিলেন। তরকারি ছিল গরুর মাংস। সেই ভাই খুব আরাম করে খাচ্ছিলেন, খাওয়া শেষে হঠাৎ তিনি কান্না করে দিলেন। মাংসের দাম শুনে তিনি বললেন, ভাই! একসময় আমার কাছে গরুর মাংস কেনাটা স্বর্ণ কেনার মতো মনে হতো। আল্লাহ আপনাকে গরুর মাংস কেনার তাওফিক দিয়েছেন।

মাদ্রাসায় পড়ার সময় তিনি কোনোদিন গরুর মাংস খেতে পাননি। বছরে শুধু একদিন তিনি মাংস খাওয়ার সুযোগ পেতেন, সেটা কুরবানীর দিন। সেদিন তারা মাদ্রাসার কিছু ছাত্র মিলে এলাকায় সবার বাড়ি বাড়ি যেতেন, যে মাংসগুলো সংগ্রহ হতো সেগুলো সবাই মিলে রান্না করতেন। এরপর চাকরি জীবনেও তিনি কোনোদিন গরুর মাংস কিনে খাওয়ার সাহস করেননি, কারণ ওনার অতি নগণ্য বেতনে গরুর মাংস কিনে খাওয়াটা বিলাসিতার মতো ছিল। তারপর সেই ভাই বললেন, এখন দুই তিন মাসে একবার হলেও মাংস কেনার চেষ্টা করি, আমার মেয়েটার জন্য। আমি চাই না আমার মেয়েটাও আমার মতো মাংস খেতে না পেয়ে আফসোস করুক।

গরুর মাংস আমারও খুব প্রিয়। ভার্সিটি থেকে অনেক দিন পরে যখন বাড়ি আসতাম, বাসায় অবশ্যই গরুর মাংস রান্না হতো। একবার পেটের সমস্যায় ডাক্তার বললেন, মাংস জাতীয় খাবার না খেতে। এরপর থেকে মাংস খাওয়া কমিয়ে দিলাম। বছরের যেদিন মাংস খুব বেশি খাওয়া হয়, সেই কুরবানীরর দিনই আমি গ্রাম থেকে শহরে চলে আসি, বাড়িতে থাকলে লোভে পড়ে মাংস খেতে হবে এই ভয়ে।

খাওয়ার পরে আমরা একটি দুআ করি যার অর্থ, "সকল প্রসংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই আহার করালেন এবং এ রিযিক দিলেন যাতে ছিল না আমার

পক্ষ থেকে কোনো উপায়, ছিল না কোনো শক্তি সামর্থ্য।" এই দুআয় আল্লাহ আহার করালেন, রিযিক দিলেন— দুইটা তো একই কথা, তাহলে একটা বললেই তো হতো, আলাদাভাবে দুইটার জন্যই আল্লাহর শুকরিয়া করার কারণ কী! মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহিমাহুল্লাহ এই দুআর বিষয়ে বলেছেন, আল্লাহ কাউকে রিযিক দিলেই সে আহার করতে পারে না। অনেক মানুষ আছে আল্লাহ যাদেরকে তাদের পছন্দের খাবার কেনার সামর্থ্য দান করেছেন, কিন্তু তারা আহার করতে পারে না, হার্টের সমস্যা, ডায়াবেটিস নানা রোগের কারণে। তাই আপনি কোনো খাবার খেতে পেরেছেন সুতরাং এতে আপনার উপর দুটি নিয়ামত। আল্লাহ আপনাকে রিযিক দিয়েছেন এবং সেই রিযিক আহার করার সামর্থ্যও দিয়েছেন। তাই খাবার শেষের দুআতে এই দুই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা হয়। সুবহানআল্লাহ, আল্লাহু আকবার!

সিরিয়ার একটা বাচ্চার ইন্টারভিউ দেখেছিলাম। সে বলছিল, মরে গেলে সে জান্নাতে যেতে চায়, কারণ জান্নাতে গেলে রুটি পাওয়া যাবে। জান্নাতে গেলে আমরা কে কী করব তার জন্য কত বিলাসী বিলাসী সব প্ল্যান। আর এই অবুঝ শিশুটা জান্নাতে যেতে চায় রুটি খাওয়ার জন্য, কারণ এই দুনিয়ায় একটু রুটিও সে খেতে পায় না।

আমি বলছিনা সবাই এখন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে, উপোষ থেকে উম্মাহর সাথে একাত্মতা দেখাতে হবে! আমি বলছি আপনাকে আপনার নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে। যে নিয়ামত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করতে। এতে আপনি আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হবেন আর না পাওয়ার আফসোস থেকে রেহাই পাবেন। দুনিয়ার পেছনে ছোটা এই যান্ত্রিক জীবনের ফিতনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন।

আর আল্লাহর কাছে যখন কোনো নিয়ামত চাইবেন সাথে আরও দুটো জিনিস চেয়ে নিবেন। এক, আপনি যেন সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারেন আর দুই, আপনি যেন সেই নিয়ামতের ফিতনা থেকে বেরোতে পারেন। সেই নিয়ামত হতে পারে ধনসম্পদ, বিয়ে, স্ত্রী, সন্তান। সেই নিয়ামত হতে পারে ইলম কিংবা হতে পারে ক্ষমতা অথবা যেকোনো কিছু। আল্লাহ এই দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষকে নিয়ামতে ভরিয়ে দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ সেই নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে পারেনি। আবার কেউ শুকরিয়া আদায় করতে পারলেও সেই নিয়ামতের ফিতনা থেকে বেরোতে পারেনি। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন। আমীন।

স্পিরিচুয়াল মার্ডার

মানুষ যে কয়টা ফিতরাত নিয়ে জন্মায় তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ফিতরাত হলো যৌনতা। মানুষের শারীরিক এবং মানসিক যৌন চাহিদা রয়েছে এবং এটা এমন এক চাহিদা যার কোনো অলটারনেটিভ নেই। তাই মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই চাহিদা চরিতার্থ করার প্রয়াস পায়—বৈধ উপায়ে না পারলে অবৈধ উপায়ে। এখন কেউ যদি বলে সে সারাদিন অশ্লীল ছবি দেখছে, পর্ণ দেখছে, বান্ধবীকে সাথে নিয়ে হাঁটে-মাঠে-ঘাটে-লিটনের ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু এটা তার মধ্যে কোনো অনুভূতিই তৈরী করছে না—তাহলে হয় সে মিথ্যে বলছে না হয় তার মেডিকেল সমস্যা আছে।

যারা আজকের আধুনিক সভ্য মানুষের আদি পিতামাতারা জংলী হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বলে গাঁজাখুরি থিউরি দিয়ে থাকে, তারাও নিজেদের ইজ্জতের বিষয়ে অল্পবিস্তর সচেতন। তাই তারা অন্তত এতটুকু বলে আদিম মানুষ বনে জঙ্গলে ল্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াত না, তারা পশুর চামড়া, ঘাস, লতাপাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখত। তারপর তাদের থিউরিতে নীতিবাক্য হিসেবে কিছু টীকা থাকে যেমন, মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই সমাজবদ্ধ, লজ্জাশীলতা সেটা আমাদের আদিম যুগ থেকেই মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব আমরা আমাদের স্কুলের বইতে পড়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে মানুষ দাবি করে এরকম একটা জংলী পূর্বপুরুষদের আদিমতা চাপিয়ে তারা এখন আধুনিক, সভ্য হয়েছে, সেই তারাই এখন পোশাক আশাকে, চালচলনে, ভাবাদর্শে সেই আদিমতাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

লজ্জাশীলতা আদিম যুগ থেকেই মানুষের মধ্যে ছিল—এই থিউরিতে বিশ্বাস করা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা আজ লজ্জাহীনতা, যৌনতা, ব্যভিচারের গল্প বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। তসলিমা নাসরিনরা দুই পয়সার বই বিক্রির জন্য নিজের, স্বামীর, মা-বাপের, চাচা, কাকু চৌদ্দ গোষ্ঠীর আকাম কুকামের ফিরিস্তি বর্ণনা করে

যায় নির্দ্বিধায়। অমুক দল বিশ্বকাপ জিতলে তমুক বিবস্ত্র হবেন, বলিউড মাতাচ্ছেন অমুক পর্ণস্টার এসব আজ আমাদের পত্রিকার শিরোনাম হয়। পর্ণস্টারদের নামে বায়ান্ন হাজার টাকা দামে ঈদের পোশাক বিক্রি হয় আমাদের মতো মুসলিম দেশে। আর আমাদের বাবা মায়েরাই সেসব পোশাক কিনে দেন তাদের মেয়েদের—জাতে তোলার জন্য—আধুনিক বানানোর জন্য। একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম, সেখানে বলা হয়েছে মাঝে মাঝে তারকারা ইচ্ছে করেই নিজেদের যৌনকর্মের ভিডিও লিক করেন, শুধুমাত্র বিখ্যাত হওয়ার জন্য, মানুষের কাছে পরিচিতি পাওয়ার জন্য, আলোচনায় থেকে তাদের আপকামিং মুভির কাটতি বাড়ানোর জন্য!

সামরিক আগ্রাসনের চেয়েও মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য কাফিররা যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো অবাধ যৌনতা, অশ্লীলতা। যৌনতা আর অশ্লীলতার এই নব্য জাহিলিয়াত ১৪০০ বছর আগের জাহিলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। সেই সময়ের জাহেলি যুগে মুশরিকরা বিবস্ত্র হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করত কারণ তারা বলত যে কাপড় পরিধান করে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে, সেই কাপড় পরিধান করে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ তারা করতে পারবে না। কিন্তু সেই জাহিলিয়াত অজ্ঞতার কারণে ছিল, আজকের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জাহিলিয়াত ছিল না। বিবস্ত্র হলেও মহিলারা তখন রাতের অন্ধকারে তাওয়াফ করত আর কবিতা আবৃত্তি করত, "আজ শরীরের কিয়দংশ অথবা পুরো শরীর বিবস্ত্র হয়ে যাবে। কিন্তু যে অংশ বিবস্ত্র হবে তা আমি পরপুরুষের জন্য বৈধ করে দেব না।" মক্কা বিজয়ের পর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত দিতে আসলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ

"হে নবি, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না..." (সূরাহ মুমতাহিনা, ৬০:১২)

তখন সাথে সাথে হিন্দ বেশ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন স্বাধীন নারী কি যিনা করতে পারে? তারা মুশরিক ছিল, অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আখলাক ছিল, হায়া ছিল, শালীনতা ছিল। আর আজকের তথাকথিত

সভ্যতার উৎকর্ষতার যুগে স্বাধীনতা আর উদারপন্থার মানে হলো বেহায়া হওয়া, নির্লজ্জ হওয়া—যার যতটা ইচ্ছে!

শয়তান চায় আপনি নির্লজ্জ হোন। শয়তানের দোসর ইসলামের শত্রুরাও চায় আপনি নির্লজ্জ হোন। কারণ তারা জানে সামরিক আগ্রাসন কিছু মানুষকে হত্যা করতে পারে, বাড়িঘর, ধনসম্পদ ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু মানুষের শরীরের ভেতর যে অন্তর—সেটা সামরিক শক্তি দিয়ে ধ্বংস করা যায় না। তবে সেটা খুব ধীরে ধীরে কলুষিত করা যায়, স্লো পয়জনিং করে অন্তরটাকে মেরে ফেলা যায়, পাথরের মতো শক্ত করে দেওয়া যায়। আর এই কাজে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হলো অশ্লীলতা, যৌনতার নোংরামি। এটা একদিকে মানুষকে নৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়, অন্যদিকে এমন এক অন্তর তৈরি করে যা আল্লাহর সাথে কোনোভাবেই কানেক্টেড হতে পারে না। আল্লাহর কিতাব শুনে সেই অন্তর থাকে নির্লিপ্ত, নিথর। কারণ সেই অন্তর মরে গেছে। তাই আল্লাহ সূরাহ আল ইসরায় বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"
(সূরাহ আল ইসরা, ১৭:৩২)

আল্লাহ কিন্তু 'লাতাযিনু' বা ব্যভিচার কোরো না স্রেফ এটা বলেননি। তিনি বলেছেন ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেও না, অশ্লীলতার ধারেকাছেও যেও না। কারণ এটা একটা পথ, وساء سبيلا—মন্দ পথ, নিকৃষ্ট পথ। অমুক মুভির ঐ কয় মিনিটের খারাপ দৃশ্যটা, ফেসবুক পেজের মাঝে মধ্যে খারাপ ছবিগুলো, ১৫+, ১৮+ যেভাবেই চিন্তা করুন না কেন—একটু একটু করে এসব কাজই আপনাকে ঐ পথে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আল্লাহ শুধু বলেননি ব্যভিচার কোরো না, বরং তিনি বলেছেন ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেও না, ঐ পথটাই কখনো মাড়িও না। কারণ এটা আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটায়, এর প্রভাব পড়ে আমাদের ঈমানে, আমাদের সালাতে, আমাদের দুআয়।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ এই আয়াতের পরের আয়াতে বলেছেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

"সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন..." (সূরাহ আল ইসরা, ১৭:৩৩)

আল্লাহ বলছেন নিরীহ মানুষকে হত্যা করো না, তার মানে শারীরিকভাবে কাউকে হত্যা করা। কিন্তু তার আগের আয়াতে আল্লাহ স্পিরিচুয়াল মার্ডারের কথা বলেছেন

فاحشة—যা অন্তরকে মেরে ফেলে। আর এরপরই এসেছে শারীরিকভাবে হত্যার কথা— قتل। আল্লাহ এখানে দুধরনের অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন, একটি স্পিরিচুয়াল মার্ডার, আরেকটি ফিজিক্যাল মার্ডার, কিন্তু স্পিরিচুয়াল মার্ডারের কথা আগে উল্লেখ করেছেন। কারণ যার আত্মা মরে যায় তার রক্ত মাংসের শরীরটার আর কী দাম থাকে! যার আত্মার শক্তি শেষ হয়ে যায় তার সিক্স প্যাক শরীরের শক্তি আর কী কাজে আসে! আর তাই শয়তান প্রথমে এই আত্মাকে শেষ করে দিতে চায়। আর সেটা আপনাকে ফাহেশা কাজে যুক্ত করার মাধ্যমে।

তাই যারা রাহমানের বান্দা হতে চায়, যারা এই দ্বীনের ঝাণ্ডা বহন করতে চায় তাদের উচিত শারীরিক এবং মানসিক দুইভাবেই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামরিক দুর্গ যেমন দরকার তেমনি দরকার আত্মাকে কলুষতা থেকে মুক্তির জন্য নিশ্ছিদ্র দুর্গ। দরকার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। দরকার সমস্ত ফাহেশা এবং মন্দ কাজ থেকে আত্মাকে হিফাযত করা। আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" (সূরাহ আশ শামস, ৯১:৯-১০)

একুশ শতকের গুরাবা

সৌদি তরুণী রাহাফ মুহাম্মাদ আলকুনুন। গতবছর এই তরুণী হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল গোটা বিশ্বে। পরিবারের সাথে কুয়েত ঘুরতে গিয়ে সে সেখান থেকে থাইল্যান্ডে পালিয়ে যায়। সেখানে এক হোটেল রুম থেকে ভিডিও বার্তায় সাহায্য চেয়ে সে জানায়, সে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তার পরিবার থেকে পালিয়ে এসেছে। এরপর সারা বিশ্বের মিডিয়ায় একযোগে সংবাদের শিরোনাম হয়ে উঠে মেয়েটি। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়া তাকে রীতিমত মাথায় তুলে নেয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে মিডিয়া কর্মীরা ছুটে আসে থাইল্যান্ডে, শুধু এই নিউজ কাভার করার জন্য। ঐদিন সে একটা টুইটার আইডি খোলে, শুধু একদিনেই টুইটারে তার ফলোয়ার ৪৮ হাজার ছাড়িয়ে যায়। জাতিসংঘ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। অনেক দেশ তাকে আশ্রয় দেওয়ার আগ্রহ দেখায়। মেয়েটি কানাডায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বয়ং কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে বিমানবন্দরে রিসিভ করতে যায়।

প্রতিদিন শত শত রিফিউজি সমুদ্রে, বনে-জঙ্গলে মরে পড়ে থাকার খবর আসে। কারও কিচ্ছু যায় আসে না। সেখানে একটি মেয়ের জন্য পুরো বিশ্ব একযোগে উঠেপড়ে লেগেছে, এত মানবতা, এত দয়া দুনিয়া জুড়ে—অবাক লাগার মতো না? এই সবকিছুর কারণ মেয়েটি ইসলাম ত্যাগ করেছে, পশ্চিমা ভোগবাদী জীবনদর্শনের প্রতি ঈমান এনেছে।

এটাই তাদের ধর্ম যে, ইসলামের কোনো কিছুকে তারা সহ্য করবে না। ইসলামের বিপরীতে যা কিছু—জাহিলিয়াত, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, সমকাম থেকে শুরু করে বাকস্বাধীনতার নামে ইসলামবিদ্বেষ—সবকিছুকেই তারা সাদরে গ্রহণ করবে, কিন্তু যখনই কেউ ইসলামের কিছু বলবে বা করবে, তারা একযোগে তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগবে। আর এটাই সেই আয়াতের সত্যতা যেটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"ইহুদি ও খৃষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।" (সূরাহ বাকারা, ২:১২০)

জাহিলিয়াত, ধর্মহীনতা, ইসলামবিদ্বেষ পশ্চিমা সমাজে এতটাই এপ্রেসিয়েট করা হয় যে, খোদ মুসলিম নামধারীরা সেখানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য নিজেদের ইসলামবিদ্বেষী, সমকামী, বাকস্বাধীনতার জন্য নিজ দেশে নির্যাতিত-অত্যাচারিত হচ্ছে, ইত্যাদি কারণ দেখায়। এবং পশ্চিমা সমাজ তাদেরকে আশ্রয় দেয়। সম্প্রতি দেশে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে এক তরুণীকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় পশ্চিমা দেশে সেটেল হওয়ার জন্য সে দীর্ঘদিন ধরে ফেসবুকে ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। আমার এক বন্ধুর কাছে তার কয়েকজন আত্মীয়ের কথা শুনেছি যারা ফ্রান্সের ভিসা পেয়েছে এই বলে যে, তারা ইসলামপন্থীদের অত্যাচার, নির্যাতন থেকে বাঁচতে সেদেশে আশ্রয় চায়। বৃটেনে ভিসা পাওয়ার জন্য এই পরিমাণ বাঙালি আবেদনপত্রে নিজেদের সমকামী পরিচয় দেয়, এক কর্মকর্তা নাকি মজা করে বলছিল, তোমাদের দেশে এত সমকামী কেন?

এমনকি পশ্চিমা দেশে Ex-Muslim নামেও সংগঠন তৈরি হয়। খোঁজ নিলে দেখা যায় এদের বেশিরভাগই কখনও মুসলিমই ছিল না। কিন্তু পশ্চিমা দেশে নিজেদের ইসলামত্যাগী পরিচয় দিলে, প্রতিনিয়ত ইসলামবিদ্বেষী কর্মকান্ডে জড়িত থাকলে আলাদা খাতির-যত্ন পাওয়া যায়। এসব সংগঠন বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর ফান্ডিংও পায়।

মাঝে মাঝে মিডিয়া জগতের অভিনেত্রীদের অভিনয় ছাড়ার খবর আসে। এর কারণ হিসেবে কেউ কেউ ধর্ম পালনে মনোযোগী হওয়ার কথা জানায়। সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে এরপর তাদের অভিনয় ছাড়া নিয়ে ব্যাপক চর্চা হয়। তারা অভিনয় ছেড়েছে, এটা কারও আপত্তির কারণ নয়, সবার আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম পালনের জন্য অভিনয় ছাড়ার কারণটা। আপনি সব করতে পারেন, যা খুশি তাই, জাহিলিয়াতে ডুবে থাকেন, কেউ আপনাকে কিছু বলবে না, আপনাকে এপ্রেসিয়েট করবে। কিন্তু যেই না ধর্মের কারণে জাহিলিয়াত ছাড়ার ঘোষণা দেবেন, সবার চোখ কপালে উঠে যাবে।

শুধু পশ্চিমা দেশে নয়, খোদ মুসলিম সমাজেই এখন ইসলাম অপাঙ্‌ক্তেয়। আজকের সমাজে মুসলিম তরুণ-তরুণীরা জাহিলিয়াতের সবকিছু করতে পারে, সকল আকাম-কুকামে এপ্রেসিয়েট করার লোক পাওয়া যাবে। যদি কেউ বিরোধিতা

করেও তারপর বলবে, আরে বাদ দাও, এই বয়সে তো এসব একটু আধটু করবেই! কিন্তু একই তরুণ-তরুণীরা যদি জাহিলিয়াত থেকে বেঁচে ইসলাম পালন করতে চায়, হঠাৎ নামায-দুআ শুরু করে, ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে, পরিবারের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। তুমি কি তাবলীগ হয়ে গেছ, শিবির হয়ে গেছ, কাদের সাথে ওঠাবসা করছ ইদানীং... ইত্যাদি নানা কথা শুনতে হবে। খোদ মুসলিমদের কাছেই জাহিলিয়াত আজ ধর্ম, আর ইসলাম চর্চা লজ্জার বিষয়।

জাহিলিয়াতের চোখ ধাঁধানো আলোতে ইসলামের আলো নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টার এই সিলসিলা অবশ্য বেশ পুরনো। সেজন্য ফিরে যেতে হবে ১৪০০ বছর আগে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন, মক্কার মুশরিকদের কাজ ছিল মানুষকে রাসূলের দাওয়াত থেকে বিরত রাখা। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনু হারেস পারস্য সফরকালে সেখান থেকে বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের কেচ্ছাকাহিনীর বই নিয়ে আসত। চটকদার এসব কেচ্ছাকাহিনী শুনিয়ে সে মানুষকে কুরআন শোনা থেকে বিরত রাখত। সে বিদেশ থেকে গায়িকা দাসী কিনে আনত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিরা যখন কাউকে কুরআন শোনাত, সে দাসীকে আদেশ দিত তাকে গান-বাজনা দিয়ে মনোরঞ্জন করতে, যাতে তার অন্তর থেকে কুরআনের বাণী মুছে যায়। সে বলত, মুহাম্মাদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং দ্বীনের জন্য জীবন দিতে বলে। এতে কষ্ট ছাড়া কিছু নেই। এসো এই গানটি শোনো এবং উল্লাস করো। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনের সূরাহ লুকমানের এই আয়াতটি নাযিল হয়,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" (সূরাহ লুকমান, ৩১:৬)

এই আয়াতের তাফসীরে আলিমরা বলেছেন এখানে "অবান্তর কথাবার্তা" বলতে জাহিলিয়াতের নানা চটকাদার কেচ্ছাকাহিনী, ক্রীড়া-কৌতুক, গান-বাজনাকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।[১০]

ইসলাম থেকে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টার উদাহরণ আরও আছে। কা'ব বিন মালিক, তাবুক যুদ্ধে না গিয়ে যিনি বাড়িতে রয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে তাঁকে পুরো মুসলিম জাতি বয়কট করেছিল। রীতিমত একঘরে হয়ে পড়েছিলেন কা'ব বিন মালিক। তাঁর এরকম অসহায় সময়ের ফায়দা লুটতে চেয়েছিলেন গাসসানের রাজা। তিনি কা'ব বিন মালিককে চিঠি লিখেছিলেন,

> "আমি জেনেছি যে আপনার সঙ্গী আপনাকে পরিত্যাগ করেছে। এভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেননি। আপনি বরং আমাদের কাছে চলে আসুন। আমরা মুহাম্মাদের চেয়েও ভালোভাবে আপনার দেখভাল করব।"

কা'ব বিন মালিক বুঝতে পেরেছিলেন এটা আল্লাহর পরীক্ষা। তিনি সেই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেন, যেন শয়তানের ওয়াসওয়াসা তাঁকে প্রভাবিত করতে না পারে।

কালের বিবর্তনে আমরা সেই সময়ে চলে এসেছি যেখানে সমগ্র পৃথিবী এক ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। ইসলাম আজ অপরিচিত, অপাঙ্‌ক্তেয়। জাহিলিয়াতের সবকিছু আজ জনপ্রিয়, আকাঙ্ক্ষিত। ইসলাম ত্যাগ, ইসলামবিদ্বেষ আজ ফ্যাশন। একদিন যে এই সময়টা আসবে, সে কথা ১৪০০ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

> "নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপিরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (নিঃসঙ্গ ও অপিরিচিত) জন্য সুসংবাদ।"
>
> যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই গুরাবা কারা? জবাবে তিনি বললেন,
>
> —"তারা কিছু ভালো মানুষ। খারাপ মানুষের বৃহৎ সংখ্যা সাপেক্ষে তাদের সংখ্যা হবে খুবই অল্প। তাদের অনুসারীর চেয়ে বিরোধিতাকারীর সংখ্যা হবে বেশি"[১১]

---

[১০] তাফসীরে মারেফুল কুরআন, সূরাহ লুকমানের ৬ নং আয়াতের তাফসীর

[১১] কিতাবুল কুরাবা, আবু বকর আল আজুররি রহিমাহুল্লাহ।

আহারে জীবন, আহারে...

একবার আমাদের এদিকে টমেটো খুব সস্তা হয়ে গেল। আমার বাসায় সারাদিন টমেটোর আলোচনা। আমার আব্বা-আম্মার প্রতিদিনের রুটিন হয়ে গেল আজকে বাজারে টমেটো কেজি কত করে বিক্রি হচ্ছে সেই খবর রাখা। একদিন নাকি টমেটো দুই টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছিল, আব্বা কিনেননি, সেটা শুনে আমার আম্মা গেলেন ক্ষেপে। দুই টাকা কেজি হওয়া সত্ত্বেও কেন টমেটো কেনা হলো না—সারাদিন সেই আলোচনা বাসায় ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। আরেকদিন বাসায় একটা আলমিরা কেনা হলো। সকাল থেকে রাত অবধি আমি শুধু আলমিরার আলোচনা শুনলাম। আলমিরার রং, ড্রয়ার, আয়না, কোথায় বসানো হবে, কোন পজিশনে কীভাবে বসালে ভালো দেখাবে, আলমিরায় কী কী রাখা হবে—পুরো একটি দিন এসব আলোচনা করে কাটল।

আমি অবাক হয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম এমন কেন হচ্ছে? সামান্য টমেটো আলোচনার বিষয়বস্তু, একটা আলমিরা নিয়ে সবাই ব্যস্ত! আমার মনে হয় আমাদের বেশিরভাগেরই এই অবস্থা। প্রত্যেক ঘরেই কমবেশি এরকম। আমি খুঁজে বের করলাম এর কারণ—আমরা একটি ভাবনা-চিন্তাহীন জীবন যাপন করছি। আমাদের মাথার উপর ছাদ আছে, থাকার জায়গা আছে, তিন বেলা খাবারের চিন্তা নেই, পরনের কাপড় যা প্রয়োজন তার চেয়ে কয়েকগুণ আছে। এই ভাবনা-চিন্তাহীন, আপেক্ষিকভাবে নিরাপদ একটি জীবনে আমাদের কোনো প্রায়োরিটি নেই, কোনো লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। আচ্ছা যাদের জীবন আমাদের মতো ভাবনা-চিন্তাহীন নয়, তারা কী চিন্তা করে? তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, তাদের প্রায়োরিটি কী থাকে?

এই যেমন ধরুন, চীনের উইঘুরের মুসলিমরা, যেখানে বাবা-মা জানে না তাদের সন্তান কোথায়। রোহিঙ্গা মায়ের কথা ধরুন, তার চোখের সামনে সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, একজন মা নিজের চোখে দেখছেন তার সন্তান আগুনে পুড়ে

অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে, একই সাথে সেই মা'কে অনেকজন মিলে ধর্ষণ করছে। সিরিয়ার কথা ধরুন, ফসফরাস বোমায় মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কিংবা ফিলিস্তিনে দেখুন দিনে দুপুরে নিজেদের ঘরবাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, হঠাৎ করে একটি পরিবার জানতে পারল তাদের থাকার কোনো ঘর নেই। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন এসব মানুষের জীবনের প্রায়োরিটি, আলোচনার বিষয়বস্তু, চেষ্টা সংগ্রাম কোনোটাই আমাদের এই নিশ্চিন্ত জীবনের মতো নয়। যেখানে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া, সেই জীবনে দুই টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রি হচ্ছে, সারাদিন এই আলোচনায় কাটিয়ে দেওয়ার কথা হয়তো তারা চিন্তাও করতে পারে না।

মানুষের জীবনে যখন কোনো পরীক্ষা থাকে না, বিপদ থাকে না, অতি জরুরি কোনো বিষয়ে যখন তাকে সংগ্রাম করতে হয় না, তখন এমন এমন বিষয়ে সে ব্যস্ত হয়ে যায়, সময় কাটায়, নিজের প্রায়োরিটি বানায়, অন্য কোনো স্থানে, সময়ে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ হয়তো এসব দেখে হাসবে। লক্ষ্যহীন, প্রায়োরিটিহীন সেই জীবন তখন ভালো রেজাল্ট করতে না পেরে আত্মহত্যা করে, সাকিব আল হাসান কেন বিশ্বকাপের ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হলো না, সেটা নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় উঠে, এত সাজগোজ করে ছবি দেওয়ার পরও ফেসবুকের প্রফাইল পিকটাতে লাইক কেন কম পড়ল সেটা নিয়ে মন খারাপ হয়, দুই টাকা দরে টমেটো কেন কেনা হলো না তার আফসোস শেষ হয় না। আমাদের মন খারাপ হওয়া, টেনশন করা, কষ্ট পাওয়াগুলো কত্ত সস্তা, অর্থহীন হয়ে যায়।

একবার একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম। পাশের টেবিলে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, পর্বত সমান শরীরের সাইজ। ভদ্রলোকের মেন্যুতে একটু গ্রেভি কম হয়েছিল, আসলে রাতের দিকে প্রায় বন্ধ হওয়ার আগে আগে সময়, গ্রেভি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর সেই ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কেন একটু গ্রেভি কম হলো এটা নিয়ে ঝগড়া করলেন, সাথে আরেকটু গ্রেভির জন্য সেই কী আফসোস!

আজ আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছিল। সে একটা হাসপাতালে ডিউটি দিতে গিয়েছিল, যেখানে বন্যা চলছে। সে বলল, একবার এমন হয়েছে, সকালের নাস্তা করার মতো কিছু নেই, চারদিকে পানি আর পানি, কোনো দোকান নেই। অনেক কষ্টে এক জায়গা থেকে কেক ম্যানেজ করে চালিয়েছে। শুধু একবেলা নাস্তা করতে পারিনি বলে তার কী অবস্থা! আর চিন্তা করুন যারা এই বন্যার পানিতে বসবাস করছে তাদের কেমন অবস্থা, তারা কীভাবে থাকছে, কীভাবে খাবার পাচ্ছে!

মানুষ যদি নিজেদের এই ভাবনা-চিন্তাহীন জীবনটাকে সত্যিকারের দুঃখ-কষ্টে পতিত জীবনগুলোর সাথে তুলনা করা শিখত তাহলে বুঝতে পারত, যেটাকে তারা দুঃখ-কষ্ট মনে করছে, যা নিয়ে তারা টেনশন করছে, মরে যাচ্ছে, এসব আসলে প্রয়োজন নয়, বিলাসিতা। অর্থহীন, সস্তা কিছু জিনিস। সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো ঈমানের পরীক্ষা, সবচেয়ে বড় কষ্ট হলো প্রিয়জন হারানোর কষ্ট, তাও চোখের সামনে, যখন আপনার কিছুই করার নেই। সবচেয়ে বড় টেনশন তো যখন আপনি জানেন আপনার থাকার জায়গা নেই, খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই। যার কোনোটাই আমাদের বেশিরভাগের উপর আসেনি। অকৃতজ্ঞ হৃদয়গুলো, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন মানুষগুলো তাই অতি তুচ্ছ কারণে টেনশন করে মরছে, অতি সস্তা কারণে কষ্ট পাচ্ছে, অতি অর্থহীন কোনো জিনিস না পেয়ে জীবনটাই দিয়ে দিচ্ছে। আহারে জীবন, আহারে...

আল্লাহ যেন আমল দিয়ে আমাদেরকে আর দশজন থেকে আলাদা করে দেন

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক অভিজাত পরিবার। পরিবারের বড় ছেলে, শিক্ষিত, সুদর্শন। বিদেশে গেল, সেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল। বছর দেড়েক পর তারই এলাকার এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু এর মধ্যে তার মানসিক সমস্যা দেখা দিল। এরকম এক পরিস্থিতিতে ছেলের মানসিক সমস্যার কথা লুকিয়ে ছেলের বাবা ছেলেকে বিয়ে দিলেন এক মেয়ের সাথে। স্বাভাবিকভাবেই খুব অল্পদিনের মধ্যেই জানা হয়ে গেল ছেলের সমস্যা। তারপর...

উপরের চরিত্রগুলো কাল্পনিক নয়। সেদিনেরও অনেক বছর পর এই চরিত্রগুলোর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেদিনের সেই ছেলের বাবা এখন মৃত্যুশয্যায়। মানসিক সমস্যা নিয়ে সেই ছেলেও এখন শেষ বয়সে, মেয়েটিও এখন বুড়ি। তাদের বিচ্ছেদ হয়নি, তাদের একমাত্র মেয়ে সেও দিব্যি সংসার করছে।

সেদিনের সেই মেয়ে তার শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামালা করেনি, ক্ষতিপূরণও চায়নি, সংসার ফেলে চলেও যায়নি। মৃত্যুশয্যায় থাকা শ্বশুর নিজে খেতে পারে না, তার পুত্রবধু তাকে খাইয়ে দেন। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে, ছোট বাচ্চাকে যেভাবে খাওয়ায় সেভাবে। শুধু দায়িত্ব পালন নয়, সেখানে মমতা আছে—দূর থেকে অবাক হয়ে এই দৃশ্য আমি বেশ সময় নিয়ে দেখেছি। রাত্রীবেলা স্বামী ঠান্ডায় কাতরাচ্ছে দেখে তাকে আর কোনোদিন নদীতে নেমে গোসল না করার উপদেশ আমি শুনেছি, সেই উপদেশে এক বুক ভালোবাসা ছিল, ছিল আগলে রাখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

এই মহিলার সাথে যা হয়েছে সেটা যুলুম, অতি উঁচু মাত্রার যুলুম। আর সেই যুলুমের বিপরীতে সে যা করেছে, করছে—সেটার নাম ইহসান। এটা তার জন্য

বাধ্যতামূলক ছিল না। শরিয়াহ মতে, দেশের আইন মতে তিনি চাইলে বিচার দাবি করতে পারতেন।

এই ইহসান দেখে হঠাৎ করে আমার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আবু বকরের ইহসানের বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, এই দুনিয়াতে আমি সবার ইহসান পরিশোধ করেছি কিন্তু আবু বকরের ইহসান পতিশোধ করতে পারিনি। কারণ তার ইহসানগুলো এমন যা স্বয়ং আল্লাহ পরিশোধ করবেন।

আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি। এই মহিলার সাথে যা হয়েছে সেটার যদি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহলে দুনিয়ার কোন জিনিসটা দিয়ে সেটা সম্ভব? আমি যুতসই কিছুই পাইনি।

আল্লাহ যদি মানুষের আমলের পাই পাই করে হিসেব নেন তাহলে কিয়ামতের দিন আমরা সবাই আটকে যাব। যদি দুনিয়ার বিচারের নিয়মে আখিরাতেও আমাদের বিচার হয় তাহলে আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। কিন্তু আল্লাহ কিয়ামতের দিন শুধু বিচারক হবেন না, তিনি সেদিন হবেন مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ —বিচারদিনের মালিক। পুরো বিচার ব্যবস্থাটারই মালিক তিনি। সেদিন আমাদের ইহসানগুলো অন্য মাত্রা পাবে। আমাদের ইহসানগুলোর জন্যই আল্লাহর কাছে একেক জনের অবস্থান একেক রকম হবে। এজন্যই আবু বকর আম্বিয়াদের পর সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

আমরা যদি সব হিসেব এই দুনিয়াতেই চুকিয়ে ফেলি তাহলে আখিরাতের জন্য কী রাখলাম! যারা জান্নাতুল ফেরদৌসের বাসিন্দা হতে চায়, যারা চায় আখিরাতে তাদেরও একটা বাড়ি হোক, লাল নীল হীরার বাড়ি, যারা চায় জান্নাতে তাদের প্রতিবেশী হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমরেরা— তারা অবশ্যই অন্যদের থেকে আলাদা। তাদের ক্ষমা আলাদা, তাদের প্রতিশোধ আলাদা, তাদের রাহমাহ আলাদা, তাদের স্বপ্ন আলাদা। আল্লাহ যেন আমল দিয়ে আমাদেরকে আর দশজন থেকে আলাদা করে দেন। আল্লাহ যেন আমাদের ভুলে ভরা এই আমলগুলো কবুল করেন। আল্লাহ যেন দয়া করে তাঁর জান্নাতে আমাদেরকে একটু ঠাঁই দেন। আমীন।

ভয়

আপনি কি ভয় পান? রাত্রিবেলা ভূত এফএম শুনে কিংবা হরর মুভি দেখে ছেলেমানুষি ভয় পাওয়ার কথা বলছি না। হারানোর ভয়, নিরাপত্তার ভয়। আল্লাহ্ বলেছেন তিনি আমাদের পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা করবেন ভয় দিয়ে— ক্ষুধাতৃষ্ণার ভয়, সম্পদ হারানোর ভয়, রিযিকের ভয়, সত্য বলার ভয়।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জান ও আয়-উপার্জনের লোকসান ঘটিয়ে পরীক্ষা করব। এমতাবস্থায় যারা সবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সূরাহ বাকারা, ২:১৫৫)

মুতাহ যুদ্ধে রোমানদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ আর মুসলিমদের মাত্র তিন হাজার। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্রই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামের পক্ষে তাঁর প্রথম যুদ্ধ ছিল এই মুতাহ যুদ্ধ। চিন্তা করুন একজন নওমুসলিম, যুদ্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন দুই লক্ষ সৈন্যের সামনে। তিনি মুসলিম বাহিনীর সাথে দাঁড়িয়ে আছেন আর দেখছেন দুই লক্ষ রোমান সৈন্য ধেয়ে আসছে। আভিজাত্যে মোড়া রোমানদের সিল্কের জামা, গোল্ড, যুদ্ধাস্ত্রের ঝলখানি দেখে আবু হুরায়রা চোখে এক রাশ বিস্ময়, ভয় নিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। দুই লক্ষের বিপরীতে মাত্র তিন হাজার যুদ্ধ করবে এই অবিশ্বাস্য সমীকরণ তিনি আগে চিন্তাও করতে পারেননি। পাশে দাঁড়িয়ে আবু হুরায়রার এই বিস্মিত, অসহায় অবস্থা দেখছিলেন সাবেত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি অভিভাবকের মতো তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, আবু হুরায়রা! বদরে তুমি আমাদের সাথে ছিলে না। সেদিন আমরা সংখ্যার আধিক্যের কারণে জয়লাভ করিনি!

হ্যাঁ, ভয় মানুষের ফিতরাতেরই একটা অংশ। সবাই খালিদ বিন ওয়ালিদ কিংবা উমর ইবনুল খাত্তাবের মতো সিংহহৃদয় হবে এমন কোনো কথা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উহুদের ময়দানে রেখে চলে গিয়েছিলেন অনেক সাহাবি, এবং আল্লাহ্ তাদের ক্ষমাও করেছিলেন। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় যে চার প্রকার শহীদের কথা আছে তাঁর এক প্রকার হলো ভীত মুমিন। তাঁর অন্তরে ভয় থাকবে। ভয়ের চোটে তিনি কাঁপতেও থাকবেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার প্রকারের শহীদের কথা বলেছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের শহীদের বিষয়ে বলা হয়েছে, সেও উত্তম ঈমানের অধিকারী মুমিন। সেও জিহাদের ময়দানে যাবে, কিন্তু তার অন্তরে ভয় থাকবে আর এই ভয়ের কারণে তার দেহ এমনভাবে কম্পিত হতে থাকে যেন তাকে বাবলা গাছের কাঁটাযুক্ত ডাল দিয়ে মারা হয়েছে। এরপর হঠাৎ একটা তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হবে এবং সে শহীদ হবে।[১২] সুবহানআল্লাহ।

দিনশেষে আমরা সবাই রক্ষ মাংসের মানুষ। আর অন্য দশজনের মতো আমরা কেউই মানবিক দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে নই। কিন্তু যে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে আলাদা করে দেবে সেটা হলো ঈমান—আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক। ঈমানের যে দাবি আমাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন আমরা সেই ঈমানের দাবিতে সত্যবাদি কি না! এবং এখানেও এডভানটেজ মুমিনদের, কেননা আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন তিনি মুমিনদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"পক্ষান্তরে যারা আমার পথে সংগ্রাম করে। আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথেই রয়েছেন।" (সূরাহ আনকাবুত, ২৯:৬৯)

আল্লাহ্ এই আয়াতে বলছেন যারা তাঁর পথে চেষ্টা সংগ্রাম করবে, মেহনত করবে, মুজাহাদা করবে—আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর পথে পরিচালিত করবেন। আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন سُبُلَنَا—এটা প্লুরাল, তার মানে শুধু একটা পথ নয়, একাধিক পথ। আল্লাহ্ তাঁর বান্দার জন্য চারপাশ থেকে পথ খুলে দেবেন।

সেই পথ আমরা কীভাবে আল্লাহর কাছে চাইব?

---

[১২] মুসনাদ আহমাদ: ১৫০

মক্কার মুশরিকরা যখন আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথীদের উপর অত্যাচার নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা বাড়িয়েই চলেছিল, যখন তাদেরকে বয়কট করা হয়েছিল, যখন তাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছিল, তখন আল্লাহ্ বললেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

"ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।" (সূরাহ বাকারা, ২:৪৫)

সুতরাং আমাদের অন্তরগুলো যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে না পড়ে। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কগুলো যেন হালকা হয়ে না পড়ে। আমাদের যত অসহায়ত্ব, যত দুঃখ-কষ্ট, আমাদের হৃদয়ের যত আর্তি আমরা যেন সেই রবের দরবারেই পেশ করি। তিনি আমাদের রব। তিনি বলেছেন বান্দা তাঁর সম্পর্কে যেমন ধারণা করবে তিনি বান্দার জন্য সেরকমটাই হবেন। তিনি তো বিশাল আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে আমাদের চাওয়াগুলো যেন সেই আকাশের চেয়েও বড় হয়। তিনি তো সাগর মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে পেশ করা আমাদের দুআগুলো যেন সাগর মহাসাগরের চেয়েও বিশাল হয়।

আল্লাহ্ যেন আমাদের অন্তরের ভয় দূর করে দেন। আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে মুনাফিক হওয়া থেকে হিফাযত করেন। আল্লাহ্ যেন আমাদের হৃদয়গুলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ্ যেন আমাদের ভুল ত্রুটিগুলোর দিকে না তাকিয়ে আমাদের নগণ্য কয়টা আমলকে কবুল করে নেন। আমীন।

নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

এক ভাইয়ের কাছে এক মাদ্রাসা শিক্ষকের ঘটনা শুনেছিলাম। তিনি খুব গরীব ছিলেন। কিন্তু আমল ও আখলাকে তাঁর মতো ধনী আর কেউ ছিল না। মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস নিজের মেয়েকে তাঁর কাছে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তা ফিরিয়ে দেন। পরে বিয়ে করেন এক পঙ্গু ও গরীব মেয়েকে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "শাইখুল হাদিসের মেয়ে আমি না নিলেও আমার চেয়ে ভালো কেউ বিয়ে করে নেবে। কিন্তু এ সমাজে কে আছে ঐ পঙ্গু মেয়েটাকে বিয়ে করবে?"

একবার সেই হুজুর ক্লাসে একটা ঘটনা বলেছিলেন। কওমি মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি মাত্রই জেনে থাকবেন, হুজুরদের বেতন-ভাতার কথা। মাসের পর মাস বেতন বাকি থাকে। রমযান মাসেও মাঝে মাঝে পাওয়া হয় না। একবার ঈদ পর্যন্ত হুজুর মাদ্রাসায় কাটালেন। কিন্তু বেতনের কোনো বন্দোবস্ত হলো না। চাঁদ রাতে নিজেকে খুব অসহায় আর ছোট মনে হচ্ছিল তাঁর। মোবাইলের দোকানে গিয়ে বউকে ফোন দিয়ে বললেন, "তুমি বাচ্চাদের নিয়ে কোনোমতে ঈদটা করে নাও। এবার হাতে কোনো টাকাপয়সা আসেনি। কিছু দিতে পারলাম না। তাই বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছে না।" হুজুরের স্ত্রী বললেন, "আমার টাকাপয়সা, জামা-কাপড় লাগবে না। আপনি চলে আসেন রাতের গাড়িতে। আপনিই আমার ঈদ। আপনাকে না দেখলে আমার ঈদ কীভাবে হবে!"

ঘটনাটা বলার পর হুজুর বললেন, ভালোবাসতে পা লাগে না! (ওনার স্ত্রী পঙ্গু ছিলেন)। কথাগুলো বলতে বলতে হুজুরের চোখ চিকচিক করছিল। মুখে অপার্থিব এক হাসি।

আজ আমরা বিয়ে করি সুন্দরী ও সম্পদ দেখে। কিন্তু ভালোবাসা খুব অদ্ভুত জিনিস। এটা যে কোথায় লুকানো থাকে! দুনিয়ার সব থেকেও কারো ঘরে

ভালোবাসা নেই, আর ঈদে একটা জামাও দিতে না পারা ছাপোষা হুজুর আর তার পঙ্গু বউয়ের সুখের টুনাটুনির সংসার! আল্লাহ্ যেন দুনিয়াতে তাদেরকে ঈমানের উপর অটল রাখেন, জান্নাতে আমাদের রবের পাশেই তাদের জন্য একটা বাড়ি বানিয়ে দেন। আমীন।

মানুষ কতই না অকৃতজ্ঞ!

একদিন ক্লাসে স্যার আমাদের হিউম্যান বডি কীভাবে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তার ম্যাকানিজম পড়াচ্ছিলেন। স্যার পড়ান বেশ মজা করে, রিয়েল লাইফের মজার মজার সব উদাহরণ টেনে এনে। হিউম্যান বডির এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে তিনি দেখালেন একটা রাষ্ট্রের প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে। শুরু থেকে বললে রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে কাঁটাতার দেওয়া থাকে, এরপর বর্ডার গার্ড আছে, ভেতরে আছে পুলিশ, স্থলে সেনাবাহিনী, জলে নৌবাহিনী এরকম আরও অনেক কিছু।

স্যার একের পর এক দেখাচ্ছিলেন রাষ্ট্রের এই সৈন্যবাহিনীর মতো মানুষের শরীরেও স্তরে স্তরে বিভিন্ন প্রতিরোধ সেল রয়েছে—যারা আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সীমান্তের কাঁটাতারের মতো মানুষের শরীরে বাইরে আছে চামড়া, শুধু তাই নয় এখানেও অনেক সেল কাজ করে যারা বিভিন্নভাবে ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাসকে মেরে ফেলে। এক ধরনের সেল আছে যারা বিষাক্ত পদার্থ ছুড়ে মারে। আরেক ধরনের সেল এক প্রকার পদার্থ ব্যাকটেরিয়ার গায়ে লাগিয়ে দেয় ফলে ব্যাকটেরিয়া আর নড়াচড়া করতে পারে না, স্ট্যাচুর মতো স্থির হয়ে যায়। এরপর ম্যাক্রোফেজ বলে একটা বিষয় আছে যারা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে গিলে ফেলে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যখন সে ব্যাকটেরিয়া গিলে বেশি সুবিধা করতে পারে না, তখন শরীরের অন্যান্য জায়গার প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নিয়োজিত সেলগুলোকে সংকেত পাঠায়—ঠিক সেনাবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট চেয়ে বার্তা পাঠানোর মতো।

রিইনফোর্সমেন্ট আসার বাহন হলো রক্ত। রক্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেল ঐ স্থানে পৌঁছে যায়। এমনকি এক ধরনের সেল আছে যারা বাইরে থেকে আসা সেলের ঐ জায়গায় ল্যান্ড করার জন্য স্থানটাকে প্রশস্ত করে দেয়। এর মধ্যে আবার B সেল এন্টিবডি তৈরী করে। স্যার বুঝাচ্ছিলেন এন্টিবডি হলো অনেকটা সৈন্যদের মিসাইল নিক্ষেপের মতো। এটা অনেকটা Y আকৃতির এবং এই মিসাইল একটার পর একটা নিক্ষেপ হতেই থাকে। এন্টিবডির এই Y আকৃতির হাতল গিয়ে

ব্যাকটেরিয়াকে আঘাত করে আর সেই সুযোগে ম্যাক্রোফেজ ঐ ব্যাকটেরিয়াকে গিলে ফেলে। এভাবে সমস্ত আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া যখন মারা যায় তখন এক ধরনের সেল আছে যারা শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে আসা রিইনফোর্সমেন্ট সেলকে আবার আগের জায়গার ফিরে যেতে সংকেত দেয়। একেবারে মিলিটারি সিস্টেম।

স্যার একেকটা স্তর আলোচনা করছিলেন আর আমি বারবার মনে মনে তাকবীর দিচ্ছিলাম। আল্লাহু আকবার। মানুষের শরীরে প্রায় একশো ট্রিলিয়ন সেল আছে যার এক শতাংশ সেল প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অংশ নেয়। স্যার বলছিলেন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে তো একটা দেশকে নিরাপত্তা দিতে টাকা দিতে হয়, কিন্তু মানব শরীরের এই ট্রিলিয়ন সৈন্যবাহিনীকে কোনো টাকা দিতে হয় না। আল্লাহ আমাদের শরীরে ফ্রিতেই এদের দিয়ে দিয়েছেন।

ক্লাসে আমার পাশের বন্ধুকে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করছিলাম এতকিছুর পরও মানুষ কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করে, কি করে বলে এসব এমনি এমনি হয়েছে!

একবার এক ডাক্তার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাকে শাহাদাহ পাঠ করানো ইমাম জিজ্ঞেস করেছিলেন কী কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করছেন? উত্তরে সেই ডাক্তার বলেছিলেন, আমার শরীরের প্রতিটি সেল সাক্ষী দিচ্ছে ইসলাম সত্য।

একজন আলিম বলছিলেন আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য এতকিছু করার দরকার নেই, আমাদের নিজেদের শরীরের দিকে তাকালেই আমাদের সিজদায় লুটিয়ে পড়া উচিত।

এক বৃদ্ধ একবার কানের সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার বলল কানে অপারেশান করাতে হবে। অপারেশন শেষে বৃদ্ধের কাছে বিল পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিল দেখে বৃদ্ধ কান্না শুরু করে দিল। ডাক্তারের এটা দেখে মায়া লাগল, তাই তিনি বললেন বিল কমিয়ে দিতে তিনি সাহায্য করবেন। বৃদ্ধ উত্তরে বলল, আমি বিল দেখে কান্না করছি না। আমি কান্না করছি কারণ সারাজীবন আমি সুস্থ ছিলাম, এই কান দিয়ে শুনে গেছি। কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে কোনোদিন এর জন্য বিল পাঠাননি। অথচ আমাদের কত অভিযোগ, কত আক্ষেপ, কত অতৃপ্তি। আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন সেটাই তো আমাদের কল্পনারও বাইরে। সারা জীবন ধরেই তো এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় সম্ভব নয়।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

"যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।" (সূরাহ ইবরাহিম, ১৪:৩৪)

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

"তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।" (সূরাহ নাহল, ১৬:৮৩)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا

"যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (সূরাহ আল ইসরা, ১৭:৬৭)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

"এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না." (সূরাহ আল ফুরকান, ২৫:৫০)

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

"মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! (সূরাহ আবাসা, ৮০:১৭)

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

"নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।" (সূরাহ আল আদিয়াত, ১০০:৬)

জীবনের ষোল আনাই মিছে।

রামাদানে আমাদের ভার্সিটির প্রায় হলগুলোতে কুরআন শিক্ষার আসর বসে। যারা কুরআন পড়তে পারে না, তাদেরকে কুরআন পড়া শেখানো হয়, তাজউইদ শেখানো হয়। পাশের হলে এক বন্ধুর সাথে এরকম একটা মজলিসে বসেছিলাম একবার। আমি আর আমার বন্ধু বসেছি সবার শেষের দিকে। আমাদের পাশেই দুইটা ছেলে ফিসফিস করে কথা বলছিল সামনে বসা এক ভাইয়ের ব্যাপারে। "ঐ যে ঐ ভাইটা দেখছিস না? ওনি কিন্তু এবার বিসিএস ক্যাডার হইছে।" "তাই! বলিস কি, কোন ক্যাডার, কোন রুমে থাকে, ভাইয়ের সাথে তো তাইলে দেখা করতে হয়.........." এরপর আর তাদের কথায় মন দিতে পারলাম না।

উস্তাদ পড়ানো শুরু করেছেন। আরবি বর্ণমালা পরিচিতি চলছিল। উস্তাদ বোর্ডে একটা আরবি বর্ণ লিখে সেই বিসিএস ক্যাডার ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন বর্ণ। ক্যাডার ভাই আমতা আমতা করা শুরু করলেন। ওনার সারাজীবনের পড়াশোনায় এটা সিলেবাসে ছিল না, তাই হয়তো পারেননি।

প্রতিযোগিতার, দৌড়ের, বড় হওয়ার, জাতে ওঠার এই সেক্যুলার সিস্টেমের জীবনটাকে সেই **'জীবনের হিসেব'** কবিতার মত মনে হয়। কতকিছুই শিখলাম, জানলাম, কত কী পারি, কত কিছু অর্জন, কিন্তু দিনশেষে আসল জিনিসটাই না পেরে জীবনের ষোল আনাই মিছে। সেদিন জুমআর খুতবায় আজকের প্রজন্মের সন্তানদের নিয়ে দুঃখ করে খতিব সাহেব বললেন, তিনি অনেক জায়গায় জানাযার নামায পড়াতে গিয়ে দেখেছেন বাবার জানাযা হচ্ছে আর ছেলে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ সে জানাযার নামায পড়তে জানে না।

আমার রুমে ছেলেদের সারাদিনের আলোচনাজুড়েই থাকত ক্যারিয়ার, কে কী করে, কার কী কী আছে এসব। একবার দেখি ঘুমানোর আগে এক ছেলে

যোগাসনের মতো বসে অনর্গল বাংলাদেশের সংবিধান মুখস্ত বলে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করতে বলল, ভাই আজকে যা মুখস্ত করলাম তা একটু ঝালাই করে নিলাম।

দুনিয়া, অর্থ বিত্ত, সম্পদ, ক্যারিয়ার, স্ট্যাটাস, আমরা লিটারেলি এসবের পূজা করি। স্রেফ পূজা, ইবাদাত! আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়া, প্রতিটা কাজের হিসেব দেওয়া, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে স্রেফ রূপকথার ফ্যান্টাসির মতো। যেন হলিউড, বলিউডের মুভি দেখার মতো একটা ব্যাপার। যতক্ষণ দেখলাম ততক্ষণ আবেগ, ভয়, ভালোবাসা, ক্লাইম্যাক্স, আর শেষ হওয়ার সাথে সাথে মনে পড়বে আরে এ তো কেবল একটা মুভি, এত সিরিয়াস হওয়ার কী আছে!

কিন্তু না! তা কক্ষণও নয়। আল্লাহর কসম, আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দিনটি সত্য। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। নিশ্চয় আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো। কী দায়িত্ব? আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।"
(সূরাহ আয যারিয়াত, ৫১:৫৬)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।" (সূরাহ নাহল, ১৬:৩৬)

ইয়াউমাল কিয়ামাহর সেই কঠিন দিনের কথা বলা হয়েছে, যেদিন দুনিয়ার পেছনে ছোটা মানুষগুলো আফসোস করবে। ষোল আনা দুনিয়া কামাই করে সেদিন তাদের আখিরাতের জীবন ষোল আনাই মিছে হবে। যারা আল্লাহর কিতাব খুলে কোনোদিন দেখেনি, আল্লাহর আনুগত্য করেনি, যারা বিচার দিবসকে ভয় করেনি,

যারা অস্বীকার করেছে সত্যকে আর বেছে নিয়েছিল মিথ্যা আর ছলচাতুরীতে ভরা দুনিয়া। আল্লাহ এসব হতভাগাদের কথা বলেছেন সূরাহ ফাজরে,

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ

"এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে?"

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

"সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!"

আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি, দ্বীন শেখার প্রতি আমাদের অবহেলাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের সেই কঠিন সময়ের হাত থেকে হিফাযত করুন। আমাদের পরিণতি যেন হয় সূরাহ ফাজরের শেষের এই আয়াতগুলোর মতো যেখানে ফেরেশতারা আমাদের ডাক দিয়ে বলবেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

হে প্রশান্ত মন,

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

وَادْخُلِي جَنَّتِي

এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।[১৩]

আমীন।

[১৩] সূরাহ ফাজর, ৮৯ : ২৭-৩০

দুটি দুআ

মানুষ পাপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়। একসময় সে নিজেই নিজেকে চিনতে পারে না। এত অবাধ্যতা, এত নাফরমানি, এত পাপাচারের পরেও কি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন? এমন সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। আর শয়তান এই 'সংশয়' এর সুযোগ নেয়। সে মানুষকে বোঝায়, দেখ ভাই! তোর কোনো আশা নেই! তুই বরং যা করছিলি সেটাই করতে থাক! অন্তত দুনিয়ার মজাটা হলেও নে!

আবার মাঝে মাঝে পাপাচারী অন্তরের ভেতরেও একটা সত্তা জেগে ওঠে, যে জানে আল্লাহ থাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে ক্ষমাটা কীভাবে চাইবে সেটা বুঝতে পারে না। সত্যি বলতে মহান রবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। কোনো বিশেষ আয়োজন করে তাঁর কাছে আসতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেকোনো সময়, যেকোনো অবস্থায় যে কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে। তিনি তো আমাদের রব। তিনি সবসময় আমাদের অপক্ষায় থাকেন। তিনি এমন একজন যিনি কখনো তাঁর কোনো বান্দাকে ফিরিয়ে দেন না।

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাওবার কথা বলতে গিয়ে বলেন,

> "যদি কোনো আল্লাহর বান্দা একই গুনাহ একশো বার কিংবা হাজার বার এমনকি তারও বেশি বার করে এবং প্রতিবার আল্লাহর কাছে তাওবা করে— আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন এবং তার গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। এমনকি যদি সে সকল গুনাহর জন্য একবার হলেও আল্লাহর কাছে তাওবা করে তারপরও তার এই তাওবা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার যোগ্য।"

এখন কথা হচ্ছে আমরা কীভাবে তাওবা করব? কী বলব? আমি জানি যেকোনো দুআর বই খুললে তাওবা, ইস্তিগফারের উপর অসংখ্য দুআ পাওয়া যাবে, কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং কথা শুনেছিলাম একজন আলিমের কাছে। যখন আদম আলাইহিসসালাম ও হাওয়া আলাইহিসসালাম জান্নাতে সেই নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করলেন, আল্লাহর ক্রোধ আর অসন্তুষ্টির কারণ হলেন—

এরপরে তাঁরা কীভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করলেন? তাঁরা আল্লাহর কাছে যেভাবে ক্ষমা চেয়েছিলেন, স্বয়ং আল্লাহ সেটা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আদম ও হাওয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করেছিলেন এই বলে,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি যুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।" (সূরাহ আরাফ, ৭: ২৩)

আরেকটি সুন্দর দুআ আছে যেটা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শিখিয়েছিলেন। একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, আমাকে এমন একটি দুআ শিখিয়ে দিন যা আমি আমার সালাতে পড়তে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এই দুআটি বললেন, যা আমরা সালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগে পড়ে থাকি।

اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْماً كَثيراً وَلا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْت ،
فَاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفورُ الرَّحيم

"হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই ক্ষমা করতে পারে না। অতএব আমাকে আপনার পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমা দ্বারা মাফ করে দিন, আর আমার প্রতি দয়া করুন; আপনিই তো ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।"

ব্যাপারটা এমন না যে এর বাইরে আর কোনো দুআ নেই। অসংখ্য দুআ আছে। কিন্তু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যম হিসেবে এই দুইটা দুআ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে প্রচণ্ড প্রভাবিত করে। কারণ একটা দুআ দিয়ে স্বয়ং আদম আলাইহিসসালাম আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আরেকটা দুআ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন, তাও কাকে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে। সুতরাং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে কখনো বিলম্ব করবেন না। কোনো বিশেষ দিনের, বিশেষ ক্ষণের অপেক্ষায় থাকবেন না। ক্ষমা চান, অন্তত নিজের উপর একটু রহম করুন।

কিশোর(!) অপরাধ

কিছুদিন আগে গাজীপুরে একই পরিবারের চার জনকে গলা কেটে হত্যা করার একটা ঘটনা ঘটে। জবাই করে হত্যার আগে মা এবং দুই স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে গণধর্ষণও করা হয়। এক প্রতিবন্ধী বাচ্চা ছেলে, তাকেও জবাই করা হয়। ভয়াবহ ঘটনা। এর কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশ এক কিশোরকে(!) গ্রেফতার করে, সে ঘটনার দায়ও স্বীকার করে। পুলিশ জানায় মোবাইল চুরি করতে গিয়ে চিনে ফেলায় কিশোর সবাইকে হত্যা করে। কিন্তু এরপর র‍্যাব আরও ছয় জনকে গ্রেফতার করে। এরপর আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে। ঐ কিশোর (!) ঘটনায় জড়িত ঠিক আছে, কিন্তু সে একা এই কাজ করেনি, সাথে এই ছয়জনও ছিল এবং এদের মধ্যে তার নিজের পিতাও আছে। অর্থাৎ বাপ আর তার কিশোর (!) ছেলে একসাথে গণধর্ষণ আর হত্যার মতো কাজ করেছে। ছেলে বাথরুমের ভেন্টিলেটর কেটে ঘরে ঢুকেছে, ভেতর থেকে দরজা খুলে বাকি সবাইকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণ দেওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমার মূল উদ্দেশ্য ঐ কিশোরকে (!) নিয়ে কিছু কথা বলা—এই আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এই কারণেই। এত ভয়াবহ একটা জঘন্য কাজের মূল হোতা হওয়ার পরও, ধর্ষণ, হত্যার মতো কাজে জড়িত থাকার পরও পুলিশ তাকে কিশোর সংশোধনাগারে পাঠিয়েছে। কেন জানেন? কারণ তার বয়স নাকি ১৭ বছর। তারচেয়েও বড় কথা, ২০১৮ সালে এক শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে সে আগেও একবার গ্রেফতার হয়েছিল, 'অপ্রাপ্তবয়স্ক'(!) হওয়ায় ৯ মাস কিশোর রিহ্যাবে আদর যত্ন খেয়ে বাইরে এসে, আবার এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এবং এটাই অন্যতম কারণ যে সে শুরুতেই সব দায় স্বীকার করে নিয়েছে, বলেছে সে একাই এই কাজ করেছে। কারণ সে জানে তার বয়স এখনো ১৮ হয়নি। তাকে বড়জোর কিশোর রিহ্যাব সেন্টারে পাঠাবে। তাই সে তার পিতা আর পিতার সাঙ্গপাঙ্গদের বাঁচানোর জন্য, নিজেই সব দোষ স্বীকার করে নেয়।

রাষ্ট্রযন্ত্রের এই 'প্রাপ্তবয়স্ক' আর 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' নির্ধারণের ব্যাপারটায় সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় কী জানেন? এই ছেলেটা যে অপরাধ করেছে সেটা যদি ১৭ বছর

৩৬৪ দিন ২৩ ঘন্টাতে করে তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তার বিচার হবে। তেমন কঠিন কোনো শাস্তি না। কয়েক বছর জেল হতে পারে, সেটাও জেলে নয়, রিহ্যাব সেন্টারে। খেলাধুলা করবে, পড়ালেখা করবে, তারপর সুবোধ বালকের মতো বের হয়ে আসবে। কিন্তু একই অপরাধটা যদি সে ১ ঘন্টা পরে করে, মানে যখন তার বয়স ১৮ হবে, তাহলে সে প্রাপ্তবয়স্ক, আর এই অপরাধে তার কঠিন শাস্তি হতে পারে। তাহলে ১ ঘন্টায় তার শারীরিক, মানসিক কী এমন পরিবর্তন হলো যে, এই আকাশ পাতাল তফাৎ শাস্তিতে?

এভাবে একজন মযলুম কখনও ন্যায়বিচার পেতে পারে না। চিন্তা করে দেখুন, যে চার জনকে খুবই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাদের পরিবার কি ন্যায়বিচার পাবে? এরা দেখবে কয়দিন পর তাদের প্রিয় মানুষগুলোকে এভাবে হত্যা করা ছেলেটা বুক ফুলিয়ে বাইরে ঘুরছে। ভারতের কুখ্যাত দিল্লী বাসের ধর্ষণ ও হত্যাকান্ডে জড়িতদের ফাঁসি হলো সেদিন। কিন্তু তাদের সাথে আরও একজন ছিল যার বয়স তখন ১৮ হয়নি। অথচ সেও ধর্ষণ করেছে, হত্যায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু তার বড় কোনো শাস্তি হয়নি, তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি, তাকে মুক্তি দিয়ে সরকার ক্যাশ টাকা দিয়েছে এবং দর্জির দোকান বানিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত না?

ইসলামে তাই কাকে কেমন শাস্তি দেওয়া হবে সেটার মানদণ্ড দিন তারিখ দিয়ে হয় না। এখানে মানদণ্ড হলো শারীরিকভাবে তার বালেগ হওয়া না হওয়া। সাধারণভাবে তিনটা সাইন দেখে ইসলামে বালেগ হয়েছে কি না সেটা নির্ধারণ করা হয়,

১। স্বপ্নদোষ

২। প্রাইভেট পার্টে চুল গজানো

৩। ১৫ বছর বয়স হওয়া।

মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা এক্সট্রা সাইন হলো ঋতুস্রাব।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার উপর তখন থেকেই শরিয়ার নিয়মনীতি, শাস্তি আরোপিত হয়। তখন থেকেই দুই ফেরেশতা তার ভালোমন্দ আমল লিখতে থাকে।

অথচ আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রগুলো যে সিস্টেম বানিয়েছে, এতে কত হাজার অপরাধী যে পার পেয়ে যাচ্ছে, কত ভুক্তভোগী যে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জীবন থেকে শেখা

সবজি কিনছি। পাশে এক দম্পতি দাঁড়িয়েছেন কচুর ছড়া কিনবেন, সাথে তাদের এক ছেলেও আছেন। কিছুক্ষণ পর ছেলে বলল, আব্বু তাড়াতাড়ি চলো, গরম লাগছে। বাবা এবার তাড়াহুড়া করে দোকানিকে বলছেন, ভাই তাড়াতাড়ি করেন, আমার ছেলের গরম লাগছে। দোকানি জিজ্ঞেস করলেন, কচুর ছড়া কি বড়গুলো দেব না ছোটগুলো। এবার মা বললেন, ছোটগুলো দেন, আমার মেয়ে ছোটগুলো খেতে পছন্দ করে।

আমাদের বাবা-মায়েদের নিজস্ব কোনো ভালো লাগা, খারাপ লাগা, পছন্দ-অপছন্দ, চাহিদা এসব থাকে না। কারণ জীবনের একটা সময় পর সন্তানের পছন্দই তাদের পছন্দ হয়ে যায়, সন্তান যা খেতে পছন্দ করে, যেভাবে পছন্দ করে, বাজার থেকে সেটাই কেনা হয়।

আমাদেরও জানার চেষ্টা করা উচিত আমাদের বাবা-মায়েরা কী খেতে পছন্দ করেন, কীভাবে খেতে পছন্দ করেন। আপনি যখন বড় হবেন, টাকা কামাই করবেন, তখন বাবা-মায়েদের পছন্দের বাজারটা করবেন, তাঁরা যা যা খেতে চায় বাজার থেকে সেটাই কিনবেন। কারণ সারাজীবন তাঁরা আপনার পছন্দে বাজার করেছেন। আল্লাহ যেন আমাদের বাবা-মায়েদের জন্য জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদ বানিয়ে দেন। আমীন।

যখন আপনি কাউকে খুব মিস করেন...

একজন মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে আপনি তার জন্য সবচেয়ে উত্তম যে কাজটি করতে পারেন সেটা হলো তার জন্য আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে দুআ করা। একজন মুসলিম ভাইয়ের জন্য আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের দুআ করার বিষয়ে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর একটি অসাধারণ কাউল এনেছেন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ, উনার বিখ্যাত আদাবুল মুফরাদ কিতাবে।

উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এক রাতে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার দৈহিক গঠন সুন্দর করেছেন, আমার স্বভাব চরিত্রও সুন্দর করে দিন।" এই অবস্থায় তিনি ভোরে উপনীত হলেন। আমি বললাম, হে আবু দারদা! কাল সারারাত ধরে আপনার দুআ ছিল সুন্দর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে। তিনি বললেন, হে উম্মে দারদা! মুসলিম বান্দা তার স্বভাব-চরিত্র সুন্দর করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সুন্দর স্বভাব-চরিত্র তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়।। আবার সে তার স্বভাব-চরিত্র খারাপ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়। মুমিন বান্দাকে তার ঘুমন্ত অবস্থায় ক্ষমা করা হয়। আমি বললাম, হে আবু দারদা! ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে ক্ষমা করা হয় কীভাবে? তিনি বলেন, তার অপর ভাই শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহর কাছে দুআ করে। আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন। সে তার অপর ভাইয়ের জন্যও দুআ করে, আল্লাহ তার সেই দুআও কবুল করেন।[১৪]

এছাড়াও মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[১৪] ইমাম বুখারি, আল আদাবুল মুফরাদ: ২৯০

> "মুসলিম তার ভাইয়ের অজ্ঞাতে তার জন্য যে দুআ করে, তা কবুল করা হয়। (দুআকালীন) তার সম্মুখে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, নিয়োজিত ফেরেশতা বলেন: আমীন, তোমাকেও এরূপ প্রদান করা হোক।"[১৫]

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

> "মহান সালাফগণ যখনই নিজের জন্য দুআর ইচ্ছা করতেন, তখন ভাইয়ের জন্য অনুরূপ দুআ করতেন। কারণ, এর ফলে তার দুআ কবুল করা হয় এবং ভাইয়ের জন্য দুআর সমপরিমাণ তাকেও প্রদান করা হয়।"[১৬]

তাই আপনি যখন কাউকে খুব মিস করেন, তার জন্য দুআ করাটাই সেই প্রিয় মানুষটির প্রতি আপনার ভালোবাসার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ। আর আমরা যেন আল্লাহর কাছে দুআ করার সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোনদের কথা ভুলে না যাই। আল্লাহ এই উম্মাহর সকলকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আমাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করুন। আল্লাহ আমাদের জান্নাতের অনিন্দ্য সুন্দর বাগানে একত্রিত করুন। আমীন।

---

[১৫] সহিহ মুসলিম: ৮৮

[১৬] হাযিহি আখলাকুনা : ১৬৬-১৬৮

ব্যথার কথা

মানুষ নিজের দুঃখকষ্ট, বিপদাপদের কথা মানুষের কাছে আগে জানায়, কাতর কণ্ঠে পেশ করে। এর ফলে সে মহান আল্লাহর কাছে কোনো কিছু পেশ করার, তাঁর উপর তাওয়াককুল করার আমলটা পরিত্যাগ করে। যখন মানুষের কিছু দরকার হয় সে অন্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরে, এর ওর কাছে হাত পাতে। এর ফলে সে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যায়, আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়ার অভ্যাসটা তার আর থাকে না।

এ দুটো অভ্যাসের কারণে মানুষ লাঞ্ছিত হয়। সবসময় মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বিপদে পড়লে কে তাকে একটু সাহায্য করবে, একটু দয়া দেখাবে সেই আশায় থাকে। এমনকি মানুষের সাথে তার সম্পর্কগুলোও হয়ে পড়ে স্বার্থের খাতিরে। যার কাছ থেকে একটু সুবিধা পাওয়া যাবে, তার কাছে তাকে জি হুজুর জি হুজুর করতে হয়। তোষামোদি করতে হয়। তার পুরো জীবনটা হয়ে পড়ে পরনির্ভরশীল।

সাহাবিরা হাত থেকে একটা লাঠি মাটিতে পড়ে গেলেও আল্লাহর কাছে চাইতেন। ব্যাপারটা এমন না যে, মাটি থেকে লাঠিটা তোলার সামর্থ্য তাদের ছিল না, বরং এটা হলো সব বিষয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ফল। আল্লাহর সত্তা, বড়ত্ব আর ক্ষমতার উপর ইয়াকীনের নির্যাস। এ কারণে তাদের জন্য আসমান থেকে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসত। এই কারণেই তারা হাজার সৈন্য নিয়ে লাখের বিপরীতে যুদ্ধ করত। এই কারণেই উস্কোখুস্কো চুল, ধূলোমাখা পা, জরাজীর্ণ জামার সেই মানুষগুলোকে প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ধনভাণ্ডারে ভরা পরাশক্তিগুলোও সমীহ করত, ভয় পেত। তারা আসমানে সম্মানিত ছিলেন, আল্লাহ তাদেরকে জমিনে সম্মানিত করে দিয়েছেন। আর আজ আমরা জমিনে সম্মানিত হতে চাই, তাই আসমানের সাহায্য আটকে থাকে।

চলতি পথে

ট্রেনে আমার পাশের সারিতে ছিল এক উপজাতি দম্পতি, অমুসলিম। তাদের একটি পরীর মতো পিচ্চি মেয়ে। চাইনিজ বাচ্চাদের মতো এত কিউট, সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তার উপর আবার কিছুক্ষণ পরপর যে মিটিমিটি হাসিটা দেয়! হঠাৎ এই নিষ্পাপ বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে মনটা খুব খারাপ হলো। বাচ্চাটা ধীরে ধীরে বড় হবে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের চর্চা করবে। ঈমান কী চিনবে না, তার আসল রবকে চিনবে না, তার আসল রবের ইবাদাত করবে না।

নিজের ঈমানটা হঠাৎ নিজের কাছেই অনেক দামি হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে রব হিসেবে চেনার নিয়ামত আমাকে দিয়েছেন। আমাকে ঈমান দিয়েছেন। শুধু, শুধুমাত্র দয়া করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহিমাহুল্লাহ এভাবে দুআ করতেন, তৎক্ষণাৎ। তারতিব আল মাদারিক কিতাবে এসেছে, আল হাসান ঈসা বিন সিরজিস নামে একজন খ্রিষ্টান ছিলেন। একবার তিনি ইবনু মুবারকের সাথে হাঁটছিলেন। ইবনু মুবারক জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?" তিনি জবাবে বললেন, "আমি একজন খ্রিষ্টান"। সাথে সাথে ইবনু মুবারক দুআ করলেন, "হে আল্লাহ্, তাকে মুসলিম হিসেবে কবুল করো।" আল্লাহ্ ইবনু মুবারকের দুআ কবুল করেছিলেন। আল হাসান বিন ঈসা এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে একজন অসাধারণ মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করেন। জ্ঞান অন্বেষণে তিনি দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করতেন, এবং একসময় তিনি উম্মাহর এক বিজ্ঞ আলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

আমি বাচ্চাটা আর তার বাবা-মায়ের জন্য দুআ করলাম। আল্লাহ যেন তাদেরকও ঈমান দান করেন। সফরে ছিলাম, আল্লাহ মুসাফিরের দুআ ফিরিয়ে দেবেন না বলেছেন। আল্লাহ যেন আমার দুআও কবুল করেন। আমীন।

আর রাহমানের দরবারে

আমার দেড় ব্যাটারির ভাতিজির এখন 'বিচ্ছু পর্যায়' চলছে। মানে এখন তার প্রধান কাজ হলো সামনে যা পায় তাতেই হাত দেওয়া, জিনিস তছনছ করা, খাট-টেবিলের চিপায় ঢুকে পড়া আর কিছুক্ষণ পরপর আছাড় খেয়ে ভ্যা ভ্যা করে কাঁদা। তবে এর মধ্যে সে এটাও বুঝে ফেলেছে এভাবে জিনিসে হাত দেওয়া, তছনছ করার কাজটা বড়রা ঠিক পছন্দ করে না। তাকে এসব 'অপরাধে' ঠিক সেই অর্থে শাসন করা হচ্ছে না, কিন্তু বড়রা এই সময় চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে, হাঁকডাক ছাড়ছে। তাই সে এখন বড়দের খুশি রাখার চেষ্টা করছে। আমার রুমে ঢুকে সে কিছুক্ষণ আমার আশেপাশে ঘুরবে, এর মধ্যে খুব মিষ্টি করে করে হাসবে, ভাব জমাবে। যখন আশ্বস্ত হবে যে বড়রা তার প্রতি এখন সন্তুষ্ট এরপর তার কার্যকলাপ শুরু হবে—কাপড় ফেলে দেওয়া, মোবাইল ধরে আছাড় মারা। এবং এরমধ্যে যদি কড়া করে কিছু বলি বা ডাক দিই, অসহায়ের মতো যেন কিছুই করেনি এমন ভাব নিয়ে এত সুন্দর করে হাসি দেয়, ইচ্ছে হয় কলিজাটা ছিড়ে দিয়ে দিই।

হঠাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। এই পিচ্চি বাচ্চাটা বোঝে কোনো বিষয়ে আপনি তার উপর রেগে গেলে কিংবা রুষ্ট হলে, আপনাকে খুশি করতে হবে। এমনকি কোনো 'অপরাধ' হয়ে গেলেও।

আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কটাও এমন। আমরা যখন পাপ করি আল্লাহ এতে রুষ্ট হন। কিন্তু আমরা যখন ক্ষমা চাই, আল্লাহ ঠিকই মাফ করে দেন, আরও বেশি খুশি হন, নিশ্চয় ছোট বাচ্চাকে আমাদের এই কলিজা ছিড়ে দেওয়ার চেয়েও বেশি খুশি! আমরা যখন আল্লাহর যিকির করি, আল্লাহর প্রশংসা করি, আল্লাহ এতে খুশি হন, আল্লাহর সাথে আমাদের ভাব জমে যায়, এতে খুশি হয়ে আমরা যা চাই তা তিনি দিয়ে দেন। অর্থাৎ আমাদের দুআ কবুল করেন।

ফুদাইল ইবনু ইয়্যাদ আল্লাহর এই দয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> "প্রতি রাতেই আল্লাহ্ বলেন, 'আমার চেয়ে বেশি দানশীল কে? তারা আমার অবাধ্য হয় আর তাদের বিছানায় আমি তাদের এমনভাবে সুরক্ষিত রাখি, যেন তারা আমার অবাধ্য হয়ইনি। আর আমি তাদের সুরক্ষা দীর্ঘায়িত করি, যেন তারা পাপ করেইনি। আর আমি তাদের পাহারা দেই, যেন তারা কোনো গুনাহই করেনি। আমি পাপাচারীর প্রতিও রিযিকের ব্যাপারে দানশীল। এমন কেউ কি আছে, যে আমাকে ডাকলে আমি তার দিকে ফিরি না? কেউ কি এমন আছে, যে কিছু চাইলে আমি তাকে দিই না? আমি দানশীল এবং দানশীলতা আমারই পক্ষ থেকে। সে যা চায়নি, তাও আমি তাকে দিই। আমার মহত্ত্বের উদাহরণ হলো এই যে, তাওবাকারীকে আমি এমনভাবে দিই যেন সে কখনও পাপ করেইনি। মাখলুকেরা আমার কাছ থেকে কোথায় পালাবে? আমার দুয়ার বাদ দিয়ে পাপাচারী আর কোন দুয়ারে যাবে?"[১৭]

আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, যখন আল্লাহর যিকির করবেন, আল্লাহর প্রশংসা করে কিছু বলবেন, সাথে সাথে কোনো দুআও করবেন। কারণ আপনি যখন আল্লাহর প্রশংসা করেছেন, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আছেন, এখনই সময় আল্লাহর কাছে কিছু চেয়ে নেওয়া। দুনিয়ার রাজা বাদশারা কারও উপর সন্তুষ্ট হলে তাকে বলতেন, বলো আমার কাছে কী চাও। তার চাওয়া পূরণ করতেন। গলা থেকে সোনা-রুপার মালা খুলে ছুড়ে দিতেন। দাসী এসে কোনো সুসংবাদ দিলে সাথে সাথে তাকে পুরস্কৃত করতেন। এজন্য রাজার কাছে কার আগে কে সুসংবাদ নিয়ে যাবে, এ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। আর তিনি তো আমাদের সবার রব, রাব্বুল আরশীল আযীম! তিনি যদি আপনার উপর সন্তুষ্ট হন, তাহলে চিন্তা করুন তিনি আপনাকে কী কী দিতে পারেন!

একটা হাদিসেও এরকমটা এসেছে। হাদিসটা তিরমিযি এবং মুসনাদে আহমাদের। ইমাম বুখারি তাঁর বিখ্যাত 'আল আদাবুল মুফরাদ'[১৮] এ বর্ণনা করেছেন। মুয়ায রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

> "একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি দুআ করছিল, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ধৈর্য প্রার্থনা করি।' এটা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[১৭] জিন ও শয়তানের জগৎ, শাইখ উমার আল আশকার, সীরাত পাবলিকেশন

[১৮] ইমাম বুখারি, আল আদাবুল মুফরাদ: ৭৩০

বললেন, আরে তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদ কামনা করলে, এখনই তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো।"

এর মানে হলো লোকটা ধৈর্য চেয়েছিল, ধৈর্য তো দরকার পড়ে বিপদের সময়। তাই সে মূলত পরোক্ষভাবে আল্লাহর কাছে বিপদই চেয়েছে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, সে যেন আল্লাহর কাছে এখন নিরাপত্তা চেয়ে নেয়।

"একইভাবে তিনি আরেক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ব্যক্তি বলছিল, 'ইয়া জালযালালি ওয়াল ইকরাম—হে গৌরব ও মহত্বের অধিকারী।' এটা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এখনই আল্লাহর কাছে কিছু চেয়ে নাও।"

অর্থাৎ সে আল্লাহর প্রশংসা করেছে, তাই এখনই সময় আল্লাহর কাছে কিছু চেয়ে নেওয়ার। সুবহানআল্লাহ!

সূরাহ ফাতিহাতেও আমরা একই ব্যাপার দেখি। শুরুর আয়াতগুলোতে আল্লাহর প্রশংসা, অতঃপর আল্লাহর কাছে দুআ।

তাই যখনই আল্লাহর যিকির করবেন, প্রশংসা করবেন, আল্লাহর পছন্দনীয় কোনো কাজ করবেন, সাথে সাথে আল্লাহর কাছে কিছু চেয়ে নিবেন। তিনি আর রহমান, তাঁর ভাণ্ডারে কিছুর কমতি নেই।

সেকেলে বাবা-মা, কিচ্ছু বোঝে না!

ভার্সিটিতে আমার এক বন্ধু ছিল, সে অর্থে দ্বীনি নয়। সে যখন তার মায়ের সাথে ফোনে কথা বলত, মনে হতো যেন খুব কাছের কোনো বান্ধবীর সাথে কথা বলছে, এত সুন্দর লাগত। আমার আরেক রুমমেট ছিল, একবার সে ফোনে অনেক্ষণ কার সাথে যেন কথা বলল। ফোনে কথা বলার স্টাইল, কথা বলার টপিক শুনে আশেপাশের সবাই ধরেই নিল তার কোনো বন্ধু হবে। যখন জিজ্ঞেস করা হলো, কে রে, বন্ধু? সে জবাব দিল, আমার বাপ! আমরা বিশ্বাসই করতে পারিনি, কেউ বাবার সাথে এভাবে কথা বলে, তাও এমন এমন সব টপিকে! ঠিক যেন ছেলেবেলার বন্ধু!

আমারও খুব ইচ্ছে হতো বাবা-মায়ের সাথে যদি এরকম সম্পর্ক থাকত, বন্ধুর মতো। কিন্তু ভার্সিটিতে পড়ার সময় আম্মাকে ফোন করলে, কেমন আছো, ভালো আছি—এর বাইরে আর কোনো কথা খুঁজে পেতাম না। আব্বার সাথে তো কোনো কথা বলারই কিছু পেতাম না। এখনো প্রায় সেরকম অবস্থা। একসময় কফি বানাতে শিখলাম, পরিচিতদের মতে আমি খুব ভালো কফি বানাই। বাসায় এসে ঠিক করলাম আব্বা-আম্মাকে কফি বানিয়ে খাওয়াব। খেয়ে আব্বা বলল, এসব পোড়া পোড়া কী জিনিস! একবার খেয়ে তারা এই জিনিসের আর ধারেকাছেও এলো না। আম্মার সাথে ফ্রী হওয়ার জন্য এরপর রান্নাবান্না শুরু করলাম, প্রায়ই এটা ওটা রাঁধি, আম্মাকে দেখাই, টেস্ট করাই, কীভাবে রান্না করেছি তার রেসিপি বলি। একবার চুল লম্বা করলাম, কত শখের জিনিস। আম্মাকে খুশি করার জন্য সেই শখের চুলগুলো কেটে ফেললাম। আরেকদিন আম্মাকে রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে গেলাম, এসব খাবার তার পছন্দ হলো না, উল্টো এসব খাবারের পেছনে এত টাকা খরচ করলাম দেখে আফসোস করা শুরু করলেন! আর এতকিছুর পরে একটা বিষয় উপলব্ধি করলাম...

ছেলেমেয়ে যখন শিক্ষিত হয়ে যায়, তাদের অশিক্ষিত বাবা-মায়ের সাথে একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। ছেলে-মেয়েরা চাইলেও বাবা-মায়েদের সাথে সহজ হতে পারে না, নানান বিষয় নিয়ে গল্প করতে পারে না। কারণ ততক্ষণে সন্তানরা এমন জীবন যাপনে, রুচি-অভিরুচিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে—যার সাথে বাবা-মায়েরা অভ্যস্ত না। ফলে সন্তানরা ঘর ছেড়ে বাইরে সময় দিতে থাকে। বন্ধুদের সাথেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট, ফুটবল, লেটেস্ট মুভি, রাজনীতি, বিশ্বনীতি নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়, একই রুচির হওয়ায় আলোচনাও জমে উঠে। আর বাবা-মায়েদের মনে হয় সেই পুরনো আমলের মানুষ, যারা 'কিচ্ছু বোঝে না'। বাবা-মাও ধরে নেয় সন্তানরা এখন বড় হয়ে গেছে, শিক্ষিত হয়ে গেছে, এখন বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক হবে—সন্তান মাস শেষের খরচ দেবে, বাসায় কী কী লাগবে এসব দেখবে, অসুখ হলে চিকিৎসা করাবে, ঈদের নতুন কাপড় কিনে দেবে... ব্যস এই তো!

একদিন ইমাম সাহেব জুমআর খুতবায় বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। বললেন, সন্তান যদি গায়ের চামড়া ছিলে সেটা দিয়ে মায়ের জন্য জুতা বানিয়ে দেয়, এরপরও তার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। আমরা যারা শিক্ষিত হয়ে গেছি, আধুনিক হয়ে গেছি, পুরনো আমলের বাবা-মায়েদের সাথে মানসিক দূরত্ব তৈরি করে নিয়েছি, আমাদের উচিত বাবা-মায়েদের সাথে বেশি বেশি সময় কাটানো। নিজের আধুনিক লেভেল এক পাশে সরিয়ে রেখে, বাবা-মায়েদের সেই পুরনো আমলের লেভেলে চলে আসা। তাদের সাথে তাদের মতো হয়ে যাওয়া। যেভাবে তারা ছোটবেলায় আমাদের সাথে আমাদের লেভেলে চলে আসত! তাদের টপিকে কথা বলা, তাদের পছন্দের খাবার নিজের পছন্দের খাবার মনে করে খাওয়া, তাদের ইচ্ছেকে নিজেদের ইচ্ছে বানিয়ে নেওয়া। আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের মতো হবে, আমাদের মতো চিন্তা করবে এটা আশা করা তো অন্যায়। বরং ন্যায্য হলো এই যে, আমরা তাদের লেভেলে চলে যাব। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

আত্মসম্মানের মরীচিকা

চট্টগ্রামে সেই কলেজ লাইফ থেকে এক জায়গায় ভাজাপোড়া খেতে যেতাম, এখনো যাই। ছোলা, পিঁয়াজি, সিঙ্গারা, সমুচা, পুরি এসব। ছোট্ট একটা দোকান। সেই দোকানে চার পাঁচ জন লোক কাজ করে। ওদেরকে সেই কলেজ লাইফ থেকে দেখে আসছি, সম্ভবত তারা সবাই মিলেই দোকানটা দিয়েছে, কাউকে কর্মচারী মনে হয় না। মাঝে মাঝে তাদেরকে দেখি আর অবাক হয়ে ভাবি এই ছোট্ট একটা দোকানে সিঙ্গারা, সমুচা থেকে এতগুলো মানুষের রিযিক।

রিযিকের ভয়ে, পেরেশানিতে অনেকের আহাজারি শুনি। তারা ডিগ্রি, সার্টিফিকেটের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। কিন্তু কারও মধ্যে কিছু করার, কিছু শেখার তাড়না নেই। সুটেড বুটেড হয়ে নয়টা-পাঁচটা জীবনের বাইরে কেউ কিছু চিন্তাও করতে পারে না। সেদিন একটা জব অফার দেখলাম। মাস্টার্স পাস, মিনিমাম তিন বছরের অভিজ্ঞতা, সেলারি আট হাজার টাকা। এটা নিয়ে আফসোস করতে থাকা এক বন্ধু, যার কাছে ব্যবসা করার মতো পুঁজি আছে, তাকে যখন গরুছাগলের ফার্মের ব্যবসায়িক লাভের কথা বলে এসব সেক্টরে ইনভেস্ট করতে বললাম, সে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল যেন এর চেয়ে অসম্মানের কাজ আর হয় না।

অথচ এরা নির্দ্বিধায় হারাম চাকরিতে ঢুকে পড়ে, সেটা কখনও তাদের আত্মসম্মানে আঘাত করে না।

উচ্চশিক্ষা আমাদের মধ্যে আত্মসম্মান তৈরি করে, এটা পজিটিভ দিক। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আমাদের এই 'আত্মসম্মান' 'ইগো' দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যায়। তার উপর আমরা হলাম বাঙালি, আমাদের ব্যাপারটাই আলাদা! বাঙালি ৭-৮ লাখ টাকা খরচ করে আরব দেশে গিয়ে মিস্ত্রি, ক্লিনার, ড্রাইভারির কাজ করবে, কিন্তু সেই টাকা দেশে গরুছাগল, ক্ষেতখামারে ইনভেস্ট করার কথা বললে, মাথায়

আকাশ ভেঙে পড়ার বিস্ময় নিয়ে তাকাবে! কেননা, আর যাই হোক 'ছেলে বিদেশ থাকে' এটা এখনো বাঙালি সমাজে, এমনকি বিয়ের বাজারে, একটি বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়।

কোনো কাজই ছোট নয়, হালাল ইনকামেই সুখ—ইত্যাদি দার্শনিক মার্কা বুলি আওড়ানো সভ্য সমাজে সুটেড বুটেড হয়ে 'কিছু একটা' করতে না পারলে সেটাকে আমাদের কাছে 'কাজ' বলে মনে হয় না। আমাদের 'ইগো' স্যাটিসফাই হয় না। আমাদের জাতে ওঠা হয় না। এই বৃত্ত ভাঙতে না পারলে শুধু এই আত্মসম্মান ধুয়ে ধুয়ে পানি খেয়েই জীবনটা পার হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে মর্যাদাবান, যার আত্মসম্মান দুনিয়ার যে কারও চেয়ে বেশি (বাঙালির চেয়েও বেশি)—সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাখালির কাজ করেছেন, মক্কা থেকে পণ্য নিয়ে সিরিয়ায় গিয়ে বিক্রি করেছেন। এমনকি প্রত্যেক নবি জীবনের কোনো এক সময় রাখালি করেছেন। সম্মানিত সাহাবিরা, সালাফদের অনেকেই এরকম ছোটখাট ব্যবসা, কাজ করতেন। জামা সেলাই থেকে কাপড়ের ব্যবসা, বকরি পালন। তাঁদের আত্মসম্মান ছিল হালাল উপার্জন, সম্মানজনক জীবিকা।

ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ার সময় আমার হলের এক রুমমেট একবার তার ঘড়ি মেরামত করতে গিয়েছিল নিউ মার্কেটে। ফুটওভারব্রিজের কাছে ফুতপাতে এক মেকানিক, শুধু কোনোমতে তার বসার জায়গাটুকু আছে ওখানে। কথায় কথায় আমার রুমমেট জিজ্ঞেস করছিল তার আয়-রোজগারের কথা। সে জানাল যে জায়গাটায় সে বসে, সেখানে বসার জন্য তাকে দিনে ২০০ টাকা দিতে হয়। আমার রুমমেট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তাহলে আপনার চলে কীভাবে? সে ভেবেছিল, এই ফুতপাতের ঘড়ি মেকানিক আর কতইবা ইনকাম করে! সেই মেকানিক মুচকি হেসে বলল, দিনে ২০০ টাকা দিয়েও দিনশেষে আমার ভালোই থাকে। আরেকবার এক হাওয়াই মিঠাইওয়ালা বলেছিল দিনে তার ইনকাম ৭০০ টাকা।

তার মানে এই না যে এখন সব গ্র্যাজুয়েটকে সবকিছু ফেলে গরুছাগল পালা, ক্ষেতখামার, রিকশা চালানো, চা, সবজি বিক্রি করতে বলছি। বলছি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কথা। বলছি সত্যিকারের 'আত্মসম্মান' অর্জনের কথা। বলছি কোথায় জিল্লতি আর কোথায় সম্মান, সেটা খুঁজে নেওয়ার কথা। বলছি সম্মানজনক হালাল উপার্জনটাকেই জীবনের লক্ষ্য বানানোর কথা।

আল্লাহ্ মানুষের কাছে রিযিক পৌঁছে দেন। হালাল পথেই। অথচ আমাদের চারপাশে যারা এই রিযিকের ভয়ে দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, দ্বীন বেচে দেয়, রিযিক নিয়ে সারাদিন পেরেশানিতে থাকে, আত্মসম্মানের বুলি আওড়িয়ে হারামকে আঁকড়ে ধরে থাকে—দিনশেষে হালাল পথ ছেড়ে হারাম পথে গিয়ে তারা আসলেই কী পেয়েছে সেটা আমি দেখেছি। তাদের জীবনগুলো জটিল থেকে জটিল হয়েছে, মনে শান্তি নেই, সমস্যার শেষ নেই।

হাসান আল বাসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন,

> "আমি কুরআনের ৯০ জায়গায় পেয়েছি—'আল্লাহ তাআলা বান্দার রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।'
>
> কেবল এক জায়গায় পেয়েছি—'শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভয় দেখায়।' (সূরাহ বাকারাহ ২:২৬৮)
>
> আমরা মহান সত্যবাদির ৯০টি ওয়াদার প্রতি আস্থা রাখি না। অথচ মিথ্যুকের এক কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি!"

ছেলে নাকি মেয়ে?

আমরা যে বাসায় থাকি তার পাশের বিল্ডিং এর মালিক, তাদের দুই সন্তান, একটি ছেলে একটি মেয়ে। দুইটাই প্রতিবন্ধী। ছেলেটা প্রায় সারাদিন অস্পষ্ট ভাষায় চিৎকার-চেঁচামেচি করে। পরপর দুটি সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়ার পর ভয়েই হয়তো তারা আর সন্তান নেননি। তাদের সব আছে, কিন্তু শান্তি কি আছে? দুটি প্রতিবন্ধী সন্তান নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা কী? বাবা-মা মারা গেলে এই দুই সন্তানকে কে দেখবে?

আমার বোনের শ্বশুরবাড়িতে আমার বোন, বোনের দুই ননদ-জা সবার সন্তান ছেলে, কারও মেয়ে নেই। সম্প্রতি বোনের ননদের দ্বিতীয় বাচ্চা হয়েছে, বাড়ির সবাই কত করে চাচ্ছিল এটা যেন মেয়ে হয়। আমার এক কাজিনের পাঁচটা সন্তান, সব ছেলে, একটা মেয়ে তারা কত করে চেয়েছেন! আবার আমার আরেক কাজিন, বিয়ের কয়েক বছর হয়ে গেছে, আল্লাহ তাদের কোনো বাচ্চা দেননি। আমার গ্রামের বাড়ির এক গরীব রিকশাচালক, তার চার পাঁচটা সন্তান, সব মেয়ে, একটা ছেলের জন্য তাদের কত আকুতি।

আল্লাহ তাআলার নিয়ামতে বরকত প্রাপ্তির প্রথম ধাপ হলো সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। আর এই শুকরিয়া আদায় করার সহজ উপায় হলো যে নিয়ামত আপনার আছে, সেই নিয়ামত যাদের নেই তাদের সাথে নিজেকে তুলনা করে দেখা। আপনার সন্তান মেয়ে বলে অসন্তুষ্ট, অথচ দেখুন কত নিঃসন্তান দম্পতি শুধু একটি সন্তানের জন্য কেঁদে মরছে। কত দম্পতি আফসোস করে মরছে তাদের কোনো মেয়ে নেই বলে। কত দম্পতি কষ্টে মরছে, কারণ তাঁদের সন্তান প্রতিবন্ধী।

শাইখ আব্দুল আযীয আত তারিফী বলেন,

> "আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের শোকর আদায় করলে দুটি নিয়ামত পাওয়া যায়। একটি হলো সেই নিয়ামতটি স্থায়ী হওয়া, আরেকটি হলো সেটিতে বরকত লাভ করা (কল্যাণজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া)। নিয়ামতের না-শোকরি করলে আল্লাহ সেই নিয়ামত ছিনিয়ে নেন। আর যদি ছিনিয়ে না-ও নেন, তাহলে তার মধ্য থেকে বরকত উঠিয়ে নেন।"[১৯]

বর্তমান শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের মধ্যে মেয়ে সন্তান নিয়ে নাক সিটকানি, অসন্তোষ তেমন একটা দেখা না গেলেও, গ্রামের দিকে দুঃখজনকভাবে মেয়ে সন্তান নিয়ে অসন্তুষ্টি আছে। এটা খুব ভয়াবহ। মেয়ে সন্তান হলে অনেকে এভাবে রিএকশান দেখায় যা কুফরির পর্যায়েও পড়ে। আমার ভাইয়ের বাচ্চা হওয়ার সময় হাসপাতালে ছিলাম। এক মহিলার সন্তান হয়েছে, আর মহিলা, মহিলার মা সবাই কাঁদছে। একজন জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে, বাচ্চার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না! তারা বলল, মহিলার এর আগের সব সন্তান মেয়ে, এবারও মেয়ে হয়েছে, মহিলার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কেউ আসেনি। সন্তান হওয়ার পর ঐ হাসপাতালে তিন দিন থাকার নিয়ম, তারা কাঁদতে কাঁদতে ঐদিনই চলে গেছে।

অথচ আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সন্তানেরা জীবিত ছিলেন তারা সবাই ছিলেন মেয়ে। সহিহ মুসলিমে এসেছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যার দুটি মেয়ে সন্তান আছে, সাবালক হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণ করবে—কিয়ামতের দিন সে আর আমি (পাশাপাশি থাকব) এবং (এ কথা বলে) তিনি তাঁর আঙুলগুলো মেলালেন। অর্থাৎ, আঙুলের মতো পাশাপাশি থাকব।"

আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "কোনো ব্যক্তির যদি একজন কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা করেনি, কোনো প্রকার অবহেলা করেনি এবং পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর কোনো প্রকার প্রাধান্য দেয়নি। আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[২০]

---

[১৯] সবুজ পাতার বন, পৃ ১৩৯, সীরাত পাবলিকেশন।

[২০] মুসনাদে আহমাদ: ২২৩/১

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অজ্ঞতার কারণে অনেক পরিবারে মেয়ে সন্তান হওয়ার জন্য মা'কে দায়ী করা হয়, তাকে অপয়া উপাধি দেওয়া হয়। কোনো দম্পতির যদি ছেলে সন্তান না হয়, সেজন্য মেডিকেলি দায়ী মূলত বাবা। কারণ ছেলে সন্তান হওয়ার জন্য যে Y ক্রোমোজোম দরকার সেটা থাকে পুরুষের কাছে। ছেলে-মেয়ে যাই হোক সেটা আল্লাহর নিয়ামত—সবাইকে দ্বীনের এই শিক্ষা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের মাঝে ছেলে সন্তান না হলে মেডিকেলি এর দায় যে বাবার—এই ব্যাপারেও সচেতনতা তৈরি করা উচিত। যারা এসব জানেন তারা পরিচিত কোনো পরিবারে এরকম হচ্ছে জানতে পারলে তাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন, বিশেষ করে শাশুড়িকে।

সব তরকারির আলু

'সব তরকারির আলু' হওয়াটা আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মোটামুটি সেফ সাইড। আলু এমন একটা সবজি যেটা প্রায় সব তরকারিতে থাকে, এটা সবাই খায়, যে খায় না সেও তরকারিতে আলু দেখে অন্তত নাক সিটকায় না। যে রাঁধে সে তরকারিতে নিশ্চিন্তে ইচ্ছেমতো আলু দিয়ে দিতে পারে, কারণ এই আলু দেখে কেউ রাগ করবে না, না খেয়ে উঠে যাবে না।

আমরা ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলি, প্রতিবাদ করি, সোচ্চার হই, কারণ ফিলিস্তিন হলো সব তরকারির আলু। সবাই ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলে—মুসলিম থেকে অমুসলিম—আব্দুল্লাহ থেকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো—সবাই আমরা ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলের চলমান যুলুম নিয়ে একমত। তাই এর প্রতিবাদ আলুর মতো সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, হজমযোগ্য, বিশেষ করে যতক্ষণ তা শান্তিপূর্ণ, অসহিংস—সে ইসরাইল যতই ফিলিস্তিনি মারুক না কেন। কিন্তু ইসরাইলের এই যুলুমের বিরুদ্ধে কেউ হার্ড লাইনে দাঁড়ালে, এই যুলুমের ইটের বিরুদ্ধে পাটকেল মারার যে বিধান ইসলামে আছে, সেই পন্থা গ্রহণ করলে সে তখন আর তরকারির আলু হিসেবে গণ্য হবে না। ইসরাইলের সমস্ত যুলুম একপাশে ফেলে এই 'সব তরকারির আলু' থেকে বেরিয়ে যাওয়া অদ্ভুত সবজিটাকে খাবার টেবিল থেকে সরিয়ে দেওয়াটা তখন ফরয হয়ে যাবে!

আমেরিকা গত দুই দশক ধরে আফগানিস্তানে যা করছে আমরা সবাই জানি এটা অন্যায়, যুলুম—আমরা এর টুকটাক প্রতিবাদও করি। কিন্তু আমেরিকার এই যুলুম আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করলে আমরা তাদের পক্ষে নই, তাঁদের বিজয়ও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সে আমাদের কাছে, আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া মিডিয়ার কাছে 'সব তরকারির আলু' নয়। ইরাক, সিরিয়া, আরাকানে যা হচ্ছে নিঃসন্দেহে তা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়, এটাও আমাদের কাছে 'সব তরকারির আলু', কিন্তু সেটা তাঁদেরকে চাল, ডাল, থাকার জন্য খুপরি,

কম্বল এসব দেওয়া পর্যন্ত। এর বাইরে গেলে কিন্তু ব্যাপারটা আর আলুর পর্যায়ে হজমযোগ্য থাকবে না।

কথাগুলো হতাশার, মন খারাপের। কিন্তু আমরা ইয়াকীনের সাথে বিশ্বাস করি, একদিন সময় পাল্টে যাবে। FBI এর মিথ্যা মামলায় ফেঁসে কারাগারে যাওয়ার আগে আদালতে দাঁড়িয়ে তারিক মেহান্না আমেরিকার ইতিহাস, চলমান ধ্বংসযজ্ঞ এসবকিছু বর্ণনা করার পর শেষে বলেছিলেন, "একটা দিন আসবে, যেদিন এই আমেরিকা বদলে যাবে, বদলে যাবে এর মানুষগুলো, তারা বুঝবে আজকের এই দিনটিতে আসলে কী প্রহসন হয়েছিল। তারা আবিষ্কার করবে কীভাবে হাজার হাজার মুসলিমদের হত্যা করেছিল, পঙ্গু করেছিল আমেরিকান সেনাবাহিনী, আর তারপরেও তাদেরকে নয়, কীভাবে কীভাবে যেন কারাগারে যেতে হচ্ছে এই আমাকেই।"

বিষপান করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার সময় সক্রেটিসের অনেক ছাত্র সেদিন সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সক্রেটিস বিষ পান করে চোখ বন্ধ করে ছিলেন, হঠাৎ তিনি চোখ খুললেন, তার এক প্রিয় ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই দিনটির কথা তোমরা মনে রেখো।" মানুষ সেই দিনটির কথা মনে রেখেছে, মনে রেখেছে বলেই আজ আমরা জানি 'সব তরকারির আলু' হয়নি বলে সক্রেটিসের সাথে অন্যায় হয়েছিল। আজ সে মানুষের কাছে হিরো, সে সময়ের 'মূলধারা' আজ ভিলেন।

৭০ জন আলিম ফাতওয়া দিয়েছিল ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ-কে হত্যা করা উচিত। সেটাই ছিল সে সময়ের 'মূলধারা'। আজ তাকিয়ে দেখুন ইমাম আহমাদ কোথায় আর সেই 'মূলধারা' কোথায়!

সুতরাং 'সব তরকারির আলু' না হলেও জীবন কারও থেমে থাকে না। হয়তো অপরিচিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত এক অসহায় 'ভিন্ন জাতের সবজি' হয়ে তাদের জীবনটা কেটে যায়, কিন্তু একদিন সময় আসবে, একদিন এই সময়টা পাল্টে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এক ঠোঙা ঝালমুড়ি এবং অতঃপর...

মাগরিবের পর ফিরছিলাম। রাস্তায় গাড়ীগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, দীর্ঘ লাইন। ফুতপাতে এক লোক ঝালমুড়ি বিক্রি করছিল। জ্যামে বসে থাকা এক ভাইয়ের ঝালমুড়ি খাওয়ার ইচ্ছে হলো। গাড়ির জানালা দিয়ে তিনি ঝালমুড়ির অর্ডার দিলেন। ঝালমুড়িওয়ালা ঝলমুড়ি মাখিয়ে প্যাকেটে ভরে যেই না দিতে যাবেন গাড়ি চলতে শুরু করল। গাড়ী চলছে, জানালা দিয়ে ১০ টাকার নোট বের করে আছেন ভদ্রলোক, ঝালমুড়ির প্যাকেট হাতে দৌড়াচ্ছেন ঝালমুড়িওয়ালা। একসময় তিনি আর গাড়ির গতির সাথে পেরে উঠলেন না, ঝালমুড়ির প্যাকেট হাতে নিজের জায়গায় ফিরতে শুরু করলেন।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটা দেখছিলাম এতক্ষণ। হঠাৎ আমারও ঝালমুড়ি খেতে ইচ্ছে হলো। ঝালমুড়িওয়ালাকে ডেকে ঝালমুড়িগুলো কিনে নিলাম। ঝালমুড়ি মুখে দিয়েই হঠাৎ মনে হলো, গাড়িতে বসে থাকা ঐ ভদ্রলোক এই ঝালমুড়ি খেতে চেয়েছিলেন, কিনতে চেয়েছিলেন, কেনার সামর্থ্যও তার ছিল। আর ঝালমুড়িওয়ালা তার জন্যই এটা বানিয়েছিলেন, বিক্রি করতে চেয়েছিলেন, দৌড়ে ধরতে চেয়েছিলেন গাড়ির গতি, কিন্তু পারেননি। মাঝখান থেকে হঠাৎ আমি এসে এখন ঝালমুড়ি খাচ্ছি।

এটাকে বলে রিযিক। যিনি দিয়েছেন তিনি আর রাযযাক। আমাদের রব। এক ব্যক্তি খাওয়ার ইচ্ছে করেছে, চেষ্টাও করেছে, সামর্থ্যও ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাকে সেটা দেননি। আমি ইচ্ছে করেছি, চেষ্টাও করেছি, আল্লাহ্ আমাকেই দিয়েছেন। এটা ক্বদর। এই সবই মহান রবের হাতে। আপনি চাইলেই সব করতে পারবেন, সামর্থ্য থাকলেই আপনি সব পাবেন ব্যাপারটা এমন হবে না। রিযিকের ফয়সালা আসমানে হয়। আমাদের জন্মেরও বহু আগে।

এসব নিয়ে চিন্তা করতে করতে হাতে থাকা ঝালমুড়িগুলো হঠাৎ অনেক মূল্যবান হয়ে গেল। দুইজন মানুষ এটার পেছনে ছুটেছে, পায়নি। আর আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, আল্লাহ্ আমার কাছে এনে দিয়েছেন। প্রাত্যহিক সব নিয়ামতই তো এমন। আমরা চিন্তা করি না। চিন্তা করলে নিজের কাছে যা আছে সেটা নিয়ে সুখে থাকতে পারতাম। বুঝতে পারতাম কত মানুষের কাছে কত কিছু নেই যা আমার আছে। বুঝতে পারতাম কত মানুষ আমার এই জীবনটাই চায়, মনে প্রাণে।

আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে তার নিয়ামত চেনার মতো অন্তর চক্ষু দান করেন। আমাদের রব যেন তার আদল ও ইনসাফের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার মতো প্রশস্ত হৃদয় দান করেন। আল্লাহ্ যেন আমাদের সিজদাগুলোতে দুফোটা চোখের পানি ফেলার নিয়ামত দান করেন। আমীন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত আমার রব, আমি তাঁর গোলাম। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার রবের বান্দা ও রাসূল।

হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল

কট্টর ছাত্র রাজনীতি করে এমন একজনকে চিনতাম। আমরা যখন হলে উঠি তখন থেকেই একনামে তাকে সবাই চিনত। সবাই তার ভয়ে তটস্থ থাকতাম। ঢাবির হলে সিট বরাদ্দ পেয়ে আরাম করে সেই সিটে উঠে পড়ার সিস্টেম নেই, ফার্স্ট ইয়ারে তো কল্পনাই করা যায় না। পরিচিত কারও মাধ্যমে পলিটিকেল 'ভাইয়া' ধরে কোনোমতে গণরুমে থাকার একটু ব্যবস্থা হয়। হলে গ্রুপ থাকে, হলে উঠতে হলে কোনো না কোনো গ্রুপের অধীনে উঠতে হয়। সেরকম একটা গ্রুপের 'বড় ভাই' ছিলেন ভদ্রলোক, সামনের কমিটির পদ প্রত্যাশী। আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত ছিল, হলে একটা ছেলেও পাওয়া যাবে না, যার মনে ঐ পাতি নেতার জন্য ক্ষোভ নেই। সমস্ত ছেলের অন্তরের বদ-দুআ তার সাথে আছে—এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত ছিলাম।

পলিটিকস করতে গিয়ে ইয়ার ড্রপ দিতে দিতে নিজের ছাত্রত্ব বাতিল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমাদের বেশ সিনিয়র হলেও একসময় আমাদের জুনিয়রে পরিণত হলেন। রাজনীতির পেছনেই লেগে থাকতেন। সেই রাজনীতির জন্য, একটা পদের জন্য সবার সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করতেন, ঐ যে বললাম—সবার অন্তরের বদ-দুআ তার সাথে আছে।

অবশেষে কমিটি হলো। পুরো ছাত্রজীবন ধরে রাজনীতি করে যাওয়া সেই ভদ্রলোক কোনো পদ পেল না। হল কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি কোথাও না। মুহূর্তেই পুরো দৃশ্যপট চেঞ্জ হয়ে গেল। একসময় যার ভয়ে সবাই তটস্থ থাকত, অনেক দূর দিয়ে গেলেও ছুটে গিয়ে হাত মিলাতে সবাই দৌড়াদৌড়ি করত, এখন সামনে পড়লেও তার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না। হলের ক্যান্টিন থেকে এখন আর তার জন্য খাবার যায় না। প্রায়ই দেখতাম চুপি চুপি এসে ক্যান্টিনের এক কোণায় বসে খাবার খাচ্ছে, হাতে চাকরির পরীক্ষার বই নিয়ে ঘুরছে। একদিন তার

সময় ছিল, সেই সময়ে সে মানুষের সাথে যেমন আচরণ করেছে, যখন সময় চলে গেল, তাকে দেখেই এখন সবাই করুণার চোখে তাকায়।

বন্ধুদের অনেকেই রাস্তায় বাস ভাংচুর করে, ক্যাম্পাসে মারামারি করে, হলে পুলাপাইন পিটিয়ে এসব পাতি নেতাদের ডান হাত, বাম হাত হয়েছিল। পড়াশোনা শেষে এখন রোজ নিয়ম করে লাইব্রেরীতে চাকরির পড়াশোনা করছে। আগের সেই চলন বলন আর নেই, দেখা হলেই গলার স্বর নিচু।

মাঝেমধ্যে ভার্সিটিতে মারামারির ঘটনা ঘটলে পত্রিকায় ছবিতে যাদের দেখতাম, অনেকেই চেনা, খুব পরিচিত। এরা সেইসব পাতি নেতা। সামনে কমিটি হবে, পদপ্রার্থী। পত্রিকায়, ফেসবুকে, টিভি ক্যামেরার সামনে কিল, ঘুষি, লাথি মারার চমকপ্রদ পোজগুলো এদের পদ পাওয়ার যোগ্যতা। এগুলো দেখিয়েই তারা কমিটিতে পদ পাওয়ার যোগ্য—এটা প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু সময় বড় অদ্ভুত জিনিস। একদিন তোমাদেরও সময়টা পাল্টে যাবে, সবারই যায়। একদিন কেউ তোমাদের আর দাম দেবে না। সেই সময়টা আসবে, অবশ্যই আসবে।

মানুষের অভিশাপ, বদ-দুআ, নিঃশব্দে দুফোঁটা চোখের পানি, আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস—খুবই ভয়াবহ জিনিস। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে যদি একটা বদ-দুআ কবুল হয়ে যায়, যদি এক ফোঁটা চোখের পানি আরশ মহলে পৌঁছায়, সেটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

আমাদের চেষ্টা, সংগ্রাম, প্রায়োরিটি

ফযরের সময় থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। নামায শেষেই এই বৃষ্টির মধ্যে ছাতা হাতে রওনা দিয়েছি। গন্তব্য জামাল খান মোড়ের কাছেই হোটেল দস্তগীর। ৫০ টাকায় (এখন সেই ৫০ টাকা আর নেই) এক বাসন ভর্তি করে গরুর নেহারি পাওয়া যায় এখানে। 'সাধ্যের মধ্যে সবটুকু সুখ' বলতে যা বোঝায় আরকি। সাধারণত খুব ভোরে না গেলে ভাগ্যে গরুর নলা জোটে না। যেতে যেতে ভাবছি এত ভোরে যাচ্ছি, তাও এরকম প্রচন্ড বৃষ্টি, নিশ্চয় আজকে ইয়া বড় এক গরুর নলা পাতে আসবেই! প্রায় আধ ভেজা হয়ে হোটেলে পৌঁছে জানতে পারলাম গরুর নলা ফুরিয়ে গেছে। ভাঙাচোরা গরুর নেহারি খেতে খেতে যিনি খাবার পরিবেশন করছেন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এত ভোরে এসেও পেলাম না, তাহলে গরুর নলা পাওয়ার জন্য কখন আসতে হবে?" তিনি জবাব দিলেন, "আমরা তো ঘুমায়া থাকি। মানুষ এসেই আমাদের ডেকে তোলে। এরা হলো আমাদের প্রথম ব্যাচ। মূলত এরাই গরুর নলা পায়।"

গরুর নলা খাওয়ার জন্য মানুষের ডেডিকেশন দেখে মুগ্ধ হলাম। নিজেরা এসেই হোটেলের লোকদের ডেকে তোলে। কী মেহনত, সুবহানআল্লাহ্! আবার সেদিন শুক্রবারে ফযরের নামাযে যাওয়ার পথে দেখি দলে দলে কিছু হাফপ্যান্ট পরা যুবক দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। তখনও বুঝতে পারিনি। পরে নামায শেষে প্যারেড ময়দানে হাঁটতে গিয়ে সেই হাফপ্যান্ট ভাইয়াদের দেখে বুঝতে পারলাম। শুক্রবার, ছুটির দিন, এত সকালে না এলে মাঠে খেলার পছন্দের জায়গা ধরা যাবে না, এজন্যই এত ভোরে রওনা দেওয়া। এত ভোরেও মাঠ ভর্তি যুবকের দল। কী ডেডিকেশন!

মানুষ যে যা পছন্দ করে সেটার পেছনে সে সময়, শ্রম দিয়ে খেটে যায়। যে অলস প্রকৃতির সে ডেডিকেশনের সাথে সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়। কারও প্রায়োরিটি

খাওয়া দাওয়া, কারও খেলাধুলা, কারও ব্যবসা, কারও চাকরি.....আবার কারও বা জান্নাত!

আবার এদিকে নিজেদের আদর্শের প্রচারেও সবাই খেটে মরছে। সবাই অন্যকে কোনো না কোনো পথের দিকে ডাকছে। সবাই নিজ নিজ আদর্শের দিকে মানুষকে আহবান করছে। সে তার মতাদর্শ মানুষের মগজে পুশ করে দিতে চাচ্ছে, সবাই চায় সকলেই সে যা মনে করে সেটা 'মনে করুক'।

সকলেরই একটি প্রায়োরিটি আছে। প্রশ্ন হচ্ছে আপনার প্রায়োরিটি কী? আপনি কি হুজুগে, স্রোতের সাগরে গা ভাসানো আর দশজন সাধারণ, নাকি আপনার কোনো আদর্শ আছে? আপনি কি সেই আদর্শের পক্ষে দাঁড়ান? আপনার কি কোনো স্বতন্ত্র সত্তা আছে? নাকি যে যা বলে, যে যা করে সেটাতেই হাঁ হু করেন?

চারদিকে চেয়ে দেখুন। একটা পছন্দের খাবার খাওয়ার জন্য মানুষের ডেডিকেশন, মাঠে খেলতে যাওয়ার ডেডিকেশন, ভালো সিজিপিএ, ভালো চাকরি, ভালো ক্যারিয়ার! অথচ আকাশের ওপারে একটা জান্নাত আছে, সেখানে আপনার একটা বাড়ি হোক, সেটার জন্য ডেডিকেশন, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা—সেটা কোথায়?

সূরাহ যিলযাল থেকে

কিয়ামতের বিভিন্ন ঘটনা পড়তে গিয়ে পেয়েছিলাম যে, সেদিন পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, সবাই সারিবদ্ধভাবে সেই সমতল ভূমিতে একত্রিত হবে। সেটা অনেক দিন আগের কথা, বুঝতে পারছিলাম না গোলাকার পৃথিবী কীভাবে সমতল হবে!

সেদিন সূরাহ যিলযাল পড়ছিলাম। আগেও পড়েছি অনেকবার। কিন্তু এবার একটা দারুণ জিনিস পেয়ে গেলাম। এই সূরাহতে আল্লাহ বলেছেন,

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

> "যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে।" (সূরাহ যিলযাল, ৯৯:১-২)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, জমিনকে যখন ভীষণ কম্পনে কম্পিত করা হবে তখন এর অভ্যন্তরস্থ সবকিছু বের হয়ে আসবে।

সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, এই ভীষণ কম্পনে জমিনের ভেতরের স্বর্ণ, রৌপ্য, সকল মূল্যবান সম্পদ বের হয়ে আসবে। হত্যাকারী সেসব দেখে বলবে, হায়! এগুলোর জন্যই আমি হত্যা করেছিলাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বলবে, হায়! এগুলোর জন্য আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। চোর বলবে, হায়! এগুলোর জন্য আমার হাত কাটা হয়েছিল! কিন্তু সেদিন তারা সেই পড়ে থাকা সম্পদ থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। সেগুলো সেদিন অর্থহীন পড়ে থাকবে।

হঠাৎ বেলুনের কথা মনে পড়ল। বেলুন থাকে গোল, ভেতরে বায়ু ভর্তি। এখন যদি এই বেলুনকে সমতল করতে চাই তাহলে কী করতে হবে? ভেতরের বায়ু বের করে দিতে হবে। সুবহানআল্লাহ! আল্লাহ ঠিক এটাই বলেছেন সূরাহ যিলযালে।

অর্থাৎ পৃথিবী প্রচন্ডভাবে কম্পিত হবে, এর ফলে এর ভেতরের সবকিছু বের হয়ে আসবে। এবং গোলাকার পৃথিবীকে আল্লাহ সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন। ঠিক বায়ু বের হয়ে যাওয়া বেলুনের মতো। সুবহানআল্লাহ! আল্লাহু আকবর!

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমার রব, আমি তার বান্দা। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। নিশ্চয় বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দিনটি সত্য, আলবৎ সত্য।

ইনসাফের এপিঠ-ওপিঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ এর একজন শিক্ষককে সম্প্রতি যৌতুক এবং ধর্ষণের অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের না হলেও মাস্টার্সে খন্ডকালীন হিসেবে একটা কোর্স পড়িয়েছিলেন। এই একটা কোর্স দিয়ে তিনি রীতিমত সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন। সবার মুখে মুখে তার নাম। প্রথম যখন পত্রিকায় নিউজটা আসে, ভাবলাম এ আর একম কী, যাকে নিয়ে মানুষ বেশি নাচে তারাই পরে কেলেঙ্কারি বাঁধায়! কিন্তু ওনার ঘটনা নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচুর লেখালেখি দেখছি।

বেশ কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ শেষে প্রাপ্ত তথ্যগুলো দেখে স্যারের উপর মায়া হলো কিছুটা। স্ত্রীকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন, স্ত্রী পুলিশ অফিসার, তার সাবেক শ্বশুরও পুলিশের বড় অফিসার। তালাক দেওয়ার সপ্তাহ দুএক পর তার নামে যৌতুকের মামলা করে পুলিশ অফিসার স্ত্রী, এত বছর সংসার করে তালাক দেওয়ার কয়দিন পর যৌতুকের মামলা! সেই মামলায় সে তো বটেই, তার বৃদ্ধ বাবাও এখন জেলে, মা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন!

যেকোনো ঘটনায়, পক্ষ-বিপক্ষের কোনো এক পক্ষ আপনার যতই আপনজন হোক না কেন, কখনোই এক পক্ষের কথা শুনে সমাধানে আসা উচিত নয়। এমনকি সে শত্রু হলেও তাকে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এবং উভয় পক্ষের কথা, মতামত, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তবেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, না হলে বেইনসাফি হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে যায়।

মাঝে মাঝে ঘটনার মধ্যেও ঘটনা থাকে। ছোট, হয়তো একেবারেই নগণ্য মনে হবে, কিন্তু এই ছোট ঘটনাই হয়তো পুরো মূল ঘটনার মোড় নির্ধারণ করে দিতে পারে। একটা ছোট উদাহরণ দিই। মায়েয ইবনু মালেক আল আসলামি নামের এক সাহাবি যিনা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাকে পবিত্র করার (শরিয়া শাস্তি দিয়ে) আর্তি জানিয়েছিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর

শরিয়া শাস্তি আরোপ করেন। আমরা সবাই এভাবেই ঘটনাটা শুনে এসেছি, জেনে এসেছি। খুব কমন ঘটনা। কিন্তু এই সাদামাটা ঘটনার ভেতরেও একটি ছোট ঘটনা আছে। সেই সাহাবি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নিজের অপরাধের কথা বলেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গোত্রের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন এটা জানতে যে, তার কোনো মানসিক সমস্যা আছে কি না। কিংবা সে সুস্থ মস্তিষ্কে এই অপরাধের কথা স্বীকার করছে কি না। একবার নয়, সে যতবার এসে নিজের অপরাধের কথা বলেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ততবার তার গোত্রের কাছে লোক পাঠিয়ে এটা জানতে চেয়েছেন, তার কোনো মানসিক সমস্যা আছে কি না। চারবার এরকম হওয়ার পর অবশেষে শাস্তি আরোপ করা হয়।

এই ঘটনা আমি অনেক জায়গায় পড়েছি। কিন্তু কোথাও ভেতরের এই ছোট ঘটনাটার উল্লেখ থাকে না। তাই আমি ভেবে এসেছি, একজন লোক এসে নিজেই স্বীকার করেছে অপরাধের কথা, এরপর রাসূল তাকে শাস্তি দিয়েছেন, এই তো ঘটনা। কিন্তু প্রতিবার সেই লোকের গোত্রের কাছে লোক পাঠিয়ে তার মানসিক সুস্থতার বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার ঘটনাটা জেনে, পুরো ব্যাপারটাতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিই চেঞ্জ হয়ে গেছে। সুবহানআল্লাহ! এই যে মাঝে একটা ছোট ঘটনা ঘটল এটা না জানা থাকলে কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে কারও প্রতি পরিপূর্ণ ইনসাফ করাটা কঠিন হয়ে যায়। এমনও তো হতে পারে সে মানসিকভাবে অসুস্থ, সে জানে না সে কী করছে। তাই যদিও সে নিজের দোষ স্বীকার করেই নিয়েছে, তারপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিউর হয়ে নিয়েছেন, সে যা বলছে স্বজ্ঞানেই বলছে।

আরেকবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এক ব্যক্তিকে ফল চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে বিচারকের কাছে আনা হলো। চুরি করেছে, ধরে হাত কেটে দিলাম—এর বদলে বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, কেন? কেন সে চুরি করেছে? লোকটি বলল, তার কাছে কোনো খাবার নেই, পরিবারের সবাই না খেয়ে আছে তাই সে চুরি করেছে। বিচারক তার শাস্তি বাতিল করে দিলেন। কারণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল তার প্রয়োজন পূরণ করা, সেই কাজে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে, তাই সে বাধ্য হয়ে চুরি করেছে।

মক্কা অভিযানের আগে অভিযানের খবর ফাঁস করে মক্কায় চিঠি লিখে দিয়েছিলেন এক সাহাবি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই খবর ওহী মারফত জানিয়ে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে

জেনেছেন, সেই চিঠি হাতেনাতে ধরা হয়েছিল, সব প্রমাণ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সাহাবিকে জিজ্ঞেস করছিলেন, কেন? কেন তুমি এমনটা করেছ বলো? সেই সাহাবি তার অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন। অতঃপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করতে চাইলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দেন, কারণ তিনি বদরি সাহাবি ছিলেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো, সবকিছু জেনেও, সব প্রমাণ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনেছিলেন, তাকে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

আর এভাবেই কে আসলে মযলুম আর কে আসলে যালিম, কে আসলে সত্যবাদি আর কে আসলে মিথ্যাবাদী—এটা নির্ণয় করতে পারা সত্যিকারের মধ্যপন্থার নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়। তাই কারও পক্ষ নেওয়ার সময়, কারও পক্ষ হয়ে কথা বলার সময় উভয়পক্ষের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে দিনশেষে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোটাই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কেননা আল্লাহ তাআলা এ উম্মাতকে মধ্যপন্থী উম্মাত বানিয়েছেন। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

> "এভাবেই আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মাত, যাতে তোমরা (কিয়ামতের দিন) মানুষ সম্পর্কে সাক্ষী হতে পার।" (সূরাহ বাকারা, ২:১৪৩)

আল্লাহ বলেছেন মুমিনরা হবে এমন মধ্যপন্থী যারা মানুষের জন্য সাক্ষী হতে পারে। সাক্ষী কেমন হয়? সাক্ষীর জন্য মধ্যপন্থী ও পরিমিতিবোধসম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য। কেননা তার সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচারক রায় দিয়ে থাকে। সে যদি তার দেখা ঘটনার যথাযথ বিবরণ না দেয়, উভয়পক্ষের মাঝখানে না থেকে কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়ে এবং সে অনুযায়ী বর্ণনায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় বা দোষ-গুণ বাড়িয়ে-কমিয়ে বলে, তবে ন্যায়বিচার সম্ভব হয় না; বরং নির্দোষ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় ও দোষী ব্যক্তি খালাস পেয়ে যায় কিংবা লঘু-দোষে গুরুদন্ড বা গুরু-দোষে লঘুদন্ড হয়ে যায়। পরিণামে সমাজে জোর-যুলুম ও অন্যায়-অনাচারের পথ খুলে যায়। সুতরাং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়-বিচারের স্বার্থে সাক্ষীর নিরপেক্ষ হওয়া ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দেওয়া অপরিহার্য।

এর বাইরে আল্লাহ আমাদেরকে তথ্য উপাত্ত যাছাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও দিয়েছেন দিকনির্দেশনা। সেটা কেমন? আল্লাহ আযযা ওয়া যাল কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।" (সূরাহ হুজুরাত, ৪৯:৬)

শুধু সাক্ষী হিসেবেই নয় আমাদেরকে কারও কাছ থেকে ইনফরমেশন নেওয়ার সময়ও আল্লাহ সতর্ক করেছেন। কারণ একটা ভুল তথ্য, একটা ভুল রায়, একজন ব্যক্তিকেই শুধু নয়, একটা পরিবার, একটা কওম, একটা রাষ্ট্রকে পর্যন্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। আমাদের দ্বীন ইসলাম সেদিকটাও গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছে।

চারদিক থেকে ফিতনা এসে আমাদেরকে গ্রাস করে নিচ্ছে। মিডিয়া সন্ত্রাসের এই স্বর্ণযুগে হিরো ভিলেন হয়ে যায়, ভিলেন হিরো হয়ে বসে। নির্দোষ ব্যক্তি অপরাধী হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে, আর অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যেন যুলুমকে ভয় করি, কারও সাথে বেইনসাফি করতে যেন আমাদের বুক কেঁপে উঠে, কারও সম্পর্কে অপবাদ দেওয়ার আগে, এক পক্ষের কথা শুনেই সেই অপবাদ মেনে নেওয়ার আগে, আমরা যেন আল্লাহকে ভয় করি। আমরা যেন মযলুমের বদ-দুআর বিষয়ে ভীত থাকি—এমন দুআ যা সরাসরি আরশ মহলে পৌঁছে যায়।

খুব শীঘ্রই আমরা একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত হতে যাচ্ছি। যেদিন আমাদের মনের সব লুক্কায়িত সত্যকে উন্মোচিত করা হবে। সেদিন আল্লাহর জন্য করা আমলগুলো ছাড়া কোনোকিছুই আর কাউন্ট হবে না, কোনোকিছুই আর কাজে আসবে না। সেদিন কেউ এসে বলবে, হে আল্লাহ! এই লোক দুনিয়াতে আমার এটা কেড়ে নিয়েছে, আরেকজন বলবে সে আমার সম্মানহানি করেছে, কেউ বলবে সে আমার ওটা নিয়েছে, আমাকে কথার দ্বারা কষ্ট দিয়েছে, আমার সম্পদ নষ্ট করেছে...

হায়! সেদিনের বাজারে বিনিময়ের একমাত্র মূদ্রা হবে দুনিয়াতে করা আমাদের ভালো আমল। দুনিয়াতে যে বেইনসাফি আমি করেছি এর বিনিময়ে সেদিন লোকেরা এসে আমার সব আমল নিয়ে যাবে। আল্লাহ যেন সেদিন আমাদেরকে বেইজ্জত না করেন। আল্লাহ যেন দুনিয়ার হিসেব এই দুনিয়াতেই মিটিয়ে দেওয়ার তাওফিক দেন। আমীন।

এক পিতার দীর্ঘশ্বাস...

চলন্ত বাসে বৃদ্ধ লোকটা কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে। মেয়েটা ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। আবার লোকটাকে দেখে মায়াও লাগছে। কেমন অসহায়ের মতো চেয়ে আছে। অনেকক্ষণ হলো লোকটা বাসে তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। হাতে বড় একটা চটের ব্যাগ, ব্যাগের ভেতর পুটলির মতো কত কী, বেশভূষা দেখে তো গ্রাম থেকে এসেছে মনে হচ্ছে। মেয়েটা এবার মুখ তুলে বৃদ্ধ লোকটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই মুখ নামিয়ে নিল, লোকটা এখনও তাকিয়ে আছে। আর ঠিক তখনই লোকটা প্রথম কথা বলে উঠল,

—"তোমার মতো আমারও একটা মেয়ে আছে। ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে। আমি মেয়ের সাথে দেখা করতে এসেছি।" মেয়েটা এবার একটু স্বস্তিবোধ করতে লাগল। সহজ হয়ে সেও কথার জবাব দিল,

— "ও আচ্ছা! দেখা হয়েছে আপনার মেয়ের সাথে?"

মেয়েটাকে অবাক করে দিয়ে বৃদ্ধ লোকটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—"এ কী! কাঁদছেন কেন? আপনার মেয়ে ঠিক আছে? কোনো সমস্যা হয়েছে?" ধরা গলায় বৃদ্ধ বলতে লাগল,

— "মেয়ে আমার সাথে দেখা করেনি। বলেছে ডিপার্টমেন্ট থেকে পিকনিকে গেছে। আমার মন ঠিক সায় দিচ্ছিল না। আমি তার ভার্সিটির ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিলাম। সেখানে জানাল ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো পিকনিক যায়নি। পরে তার এক বান্ধবীর কাছে জানলাম, সে পিকনিকে যায়নি। এক ছেলের সাথে কক্সবাজার গেছে।"

বৃদ্ধ লোকটা কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে। লজ্জায়, অপমানে, বুক ভরা কষ্টে তার চোখ বেয়ে পানি উপচে পড়ছে। চেষ্টা করেও তিনি তা আটকাতে পারছেন না।

এর পরের পুরোটা সময় আর কেউ কোনো কথা বলেনি। গন্তব্যের কাছাকাছি এসে মেয়েটা নেমে গেল। এতক্ষণ ধরে আটকে রাখা চোখের পানি সে আর আটকে রাখতে পারল না। কাঁদতেই কাঁদতেই বাড়ির দিকে রওনা হলো। আজ থেকে সে নিজের সাথে নিজে শপথ করেছে। যতদিন বেঁচে থাকবে, কোনোদিন সে বাবা-মা'কে কষ্ট দেবে না। কোনোদিন না।[২১]

[২১] সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

একটি বিশুদ্ধ অন্তরের প্রার্থনায়

ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম। পাশেই এসে থামল একটা রিকশা। রাগে গজরাতে গজরাতে এক মুরব্বি নামলেন, পোশাকে আর বেশভূষায় আভিজাত্যের ছাপ। রিকশাওয়ালার সাথে কী নিয়ে বনিবনা হলো না জানি না, ভদ্রলোক ভাড়া না দিয়েই বেশ দম্ভভরে হাঁটা শুরু করলেন। পেছন থেকে রিকশাওয়ালা আবেগভরা কণ্ঠে একটা ডায়ালগ দিলেন, "ঠিক আছে, ময়দানের দিন হিসেব হবেনি।" অর্থাৎ রিকশাওয়ালা বুঝিয়েছে, হাশরের মাঠে যেদিন হিসেব হবে সেদিন সে এই পাওয়ানাটা বুঝে নেবে। ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় সাত-আট বছর আগের। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সেই ভদ্রলোক যেভাবে দম্ভভরে হেঁটে যাচ্ছিলেন, সেটা এখনো আমার চোখে ভাসে।

অন্যের তুলনায় নিজের স্ট্যাটাস নিয়ে, ধনসম্পদ নিয়ে, সৌন্দর্য নিয়ে, অর্জিত জ্ঞান নিয়ে, এমনকি অনেক সময় নিজের আমল-ইবাদাত নিয়ে আমরা দম্ভভরে ঘুরে বেড়াই। আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থেকে সেই নিয়ামত নিয়ে আমরা গর্ব করি। মানুষকে মানুষ মনে করি না, পাত্তা দিই না, গোণায় ধরি না, কাউকে নিজের সমকক্ষ মনে করি না। দম্ভভরে মানুষের হক্ব মেরে খাই, যেন সেটা আমাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। অহংকার, দম্ভ আমাদেরকে প্রতিনিয়ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। কাউকে সহ্য করতে পারি না, কারও সফলতা মেনে নিতে পারি না— ঈর্ষায় ভেতরটা ছারখার! নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে চাই না, নিজের ভুল মানতে নারাজ। নিজের সাথে কারও তুলনা মেনে নিতে পারি না, নিজে যেটা করি সেটা ছাড়া আর কিছুকেই ধর্তব্যে ধরি না। যদি কখনও কুরআনের পাতাগুলো উল্টে দেখেন, দেখবেন এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল ফিরআউন, আবু জাহেল আর সেসব লোকদের, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন।

সেই ইবলিশ থেকে এই একবিংশ শতাব্দী, অহংকার মানুষকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে যাচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

অহংকার কী? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই হাদিসে বলেছেন, অহংকার হলো, সত্যকে প্রত্যাখান করা ও মানুষকে ছোট করে দেখা।[২২]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "একজন লোক হাঁটছিল, সে নিজের পরিধেয় পোশাক গর্বের সাথে মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে চলছিল, তার চুল ছিল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, আল্লাহ মাটিকে আদেশ করলেন তাকে গিলে ফেলতে এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সে এইভাবে মাটির নিচে ডুবতে থাকবে।"[২৩]

তাহলে সমাধান কী? সমাধানটা হলো এক আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া, নিজেকে একজন গোলাম হিসেবে, একজন নিতান্তই তুচ্ছ বান্দা হিসেবে। নিজের নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া, বিনয়ী হওয়া। আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে সবসময় নিজের চেয়ে যারা নিচে তাদের দিকে তাকানো— যেভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।

কোনো একদিন ব্যস্ত কোনো রাস্তায় খালি পায়ে হেঁটে আসা, বিলাসিতা পরিত্যাগ করা, আভিজাত্য প্রকাশ পায় এমন কাপড় পরিধান না করা, ছোট-বড়-শ্রমিক মজুর সবাইকে আগ বাড়িয়ে সালাম দেওয়া। রাস্তার পাশে কোনো দোকানে দিনমজুর মানুষগুলো কত আরাম করে খায়— কোনো একদিন তাদের সাথে খেতে বসে যাওয়া। কারও প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষোভ থাকলে আল্লাহর কাছে তার জন্য দুআ করা, তাকে উপহার পাঠানো, ফেসবুকে বিদ্বেষ আর অহংকারবশত কাউকে ব্লক করে দিলে ব্লক খুলে আবার নিজ থেকে তাকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠানো। এবং হ্যাঁ, দুনিয়াদার, বিলাসী, ফুর্তিবাজ, কৌতুকবাজ মানুষগুলোর সঙ্গ চিরতরে ত্যাগ করা।

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে বসে ছিলেন। বললেন, এখন একজন লোক আসবে যে জান্নাতি হবে। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। পরের দুই দিনও এরকম হলো। এই দেখে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর

---

[২২] সহিহ মুসলিম : ৯১

[২৩] সহিহ বুখারি : ৩২৯৭, সহিহ মুসলিম : ২০৮৮

ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জানতে খুব ইচ্ছে হলো কী আছে এই লোকের মধ্যে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জান্নাতি বললেন! তিনি সাদের সাথে তিন দিন থাকার বন্দোবস্ত করলেন। এই তিন দিনে তিনি সাদের মধ্যে এমন আহামরি কোনো আমল দেখতে পেলেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে বলেই বসলেন, আসলে আমি দেখতে চেয়েছি আপনি কী এমন আমল করেন যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতি বললেন। সাদ বললেন, তুমি যা দেখেছ এটাই আমি, এর বাইরে আমার আর কোনো বিশেষ আমল নেই। ইবনুল আস যখন চলে যাচ্ছিলেন সাদ পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললেন, "তবে হ্যাঁ, আমি যখন রাতে ঘুমোতে যাই, আমার সকল মুসলিম ভাইদের মাফ করে দিয়ে ঘুমোতে যাই। কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ, ক্ষোভ পুষে রাখি না।" আবদুল্লাহ ইবনু আমর বললেন, এটাই সেই কারণ যার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতি বলেছেন।

আল্লাহ্ যেন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো আমাদের অন্তরগুলোকেও অহংকার, বিদ্বেষ, ক্ষোভ থেকে মুক্ত করে দেন। দিনশেষে সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতে পারার নিয়ামত থেকে আল্লাহ যেন আমাদরকে বঞ্চিত না করেন। কিয়ামতের দিনে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি এরকম মানুষের বিশাল লিস্ট জমা দিয়ে আল্লাহর কাছে যেন আরশের ছায়া চেয়ে নিতে পারি সেই তাওফিক আমাদেরকে দান করেন। আমীন।

স্বাধীনতা "মানুষ কী বলবে" নামের ঐ কারাগার থেকে মুক্তিতেই।

আপনার যুহুদকে তারা কিপ্টামি বলে টিটকারি মারবে। আপনার সুন্নাতের প্রতি ইত্তেবাকে একটু বেশি বেশি বলে মুখ বাঁকাবে। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিকে তারা আপনার মেরুদন্ডহীনতা ভেবে বসবে, নানান সফল মানুষের উদাহরণ টেনে আনবে অনায়াসে...

আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে একদিন যাচ্ছিলেন। একটা কান কাটা মরা ছাগল পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কি এটা এক দিরহামের বিনিময়ে কিনতে আগ্রহী? কেউ আগ্রহ দেখাল না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কি এটা বিনা পয়সায় পেতে আগ্রহী? এবারও কেউ আগ্রহ দেখাল না। প্রিয় নবিজি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেরূপ নিকৃষ্ট, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট।

এই কান কাটা এই মরা ছাগলের পেছনে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকা কুকুরের মতো ছুটতে থাকা মানুষগুলো আপনাকে শেখাবে জীবনের সফলতা কিসে! কখনো আল্লাহর কালামের মলাট ছুঁয়ে না দেখা হতভাগারা আপনার জন্য আফসোস করবে, আপনার জীবনে কী হবে সে ভেবে! অদ্ভুত না!

দুনিয়া তো এমনিতেই কারাগার। এই কারাগারের ভেতরই আরেক কারাগার—মানুষ কী বলবে...সমাজ কী বলবে...অমুক কী বলবে...তমুক কী মনে করবে! আপনার আমার মতোই কত শত এই কারাগারে বন্দী হয়ে আছে, বিক্রি হয়ে আছে অতি সস্তা দরে।

চাকচিক্য আর প্রাচুর্যের আতুর ঘরে আজ হাদিস নিয়ে কথা হয়। বলা হয় আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত...

আহারে আবু হুরায়রা! যে আবু হুরায়রা শুধু রাসূলের মুখ থেকে হাদিস শোনার জন্য দুনিয়াকে পায়ের নিচে পিষে ফেলেছিলেন অনায়াসে। মাঝে মাঝে তিনি রাসূলের মজলিসে অন্য সাহাবির পেছনে লুকিয়ে থাকতেন। কারণ ওনার যে কাপড়টা ছিল সেটা দিয়ে পুরো শরীরটা ঠিকমতো ঢাকতে পারতেন না। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

কাফিরদের মতো জিল্লতির জীবনের স্বপ্ন বুনে আজ আমরা আফসোস করি কেন আল্লাহ এই উম্মাহকে বিজয় দান করছে না! কেন আজ মুসলিমরা সব জায়গায় নির্যাতিত হচ্ছে?

অথচ জান্নাত ঐ নববি আদর্শেই। যে জীবন সুন্নাতের, যুহুদের, আল্লাহর দ্বীনের জন্য কুরবানীর। স্বাধীনতা 'মানুষ কি বলবে' নামের ঐ কারাগার থেকে মুক্তিতেই। আর জিল্লতি এই দুনিয়াতেই। কান কাটা মরা ছাগলের পেছনে হাঁপানো কুকুরের মতো ছুটতে থাকা এই জীবনটাই অপমানের, লাঞ্ছনার।

একটি লাভজনক ব্যবসা

সেদিন বাসে করে অফিসে আসছিলাম। এক হুজুর এসে বসল পাশের সিটে। আমি পড়ছিলাম শাইখ খালিল আল হোসেনানের লেখা "রাসূল (সা.) এর ১০০০ সুন্নাত" বইটি। আমাকে পড়তে দেখে মুরব্বি হুজুর বেশ আগ্রহ নিয়ে বইটার দিকে তাকালেন, আমার থেকে চেয়ে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখলেন, দাম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করলেন। বুঝলাম খুব পছন্দ হয়েছে। বাস থেকে নামার সময় বইটা হুজুরকে হাদিয়া দিয়ে আসলাম।

খুব ছোট একটা ইনভেস্ট, যদিও দুনিয়াতে হয়তো তেমন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই ছোট ব্যবসাটাও বেশ দামি, কারণ ব্যবসাটা স্বয়ং আল্লাহর সাথে। এই হুজুর ভাই এই বইটা পড়ে যা আমল করবে সেটা তো সে পাবেই, আর ফ্রি-তে আমার আমলনামাতেও যোগ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বইটা যদি হারিয়েও যায়, উনি যদি সেখান থেকে পাঁচটা আমলও কন্টিনিউ করেন, যতজনকে সেই আমল শেখাবেন, তারা যতজনকে শেখাবে, তারা যতজনকে শেখাবে....সব চক্রাকারে একটা অংশ আমার কাছেও চলে আসবে। সুবহানআল্লাহ! এটা তো গেল তাদের আমলের শেয়ার, আল্লাহর কাছ থেকেও তো আছে, সেটা আবার দশগুণ। আল্লাহ বলেন,

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"যে একটি সৎকাজ করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" (সূরাহ আন'আম, ৬:১৬০)

আমরা সবাই ব্যবসা করি, সুযোগ খুঁজি কোন জায়গায় ব্যবসা করলে ভালো লাভ হবে, কোন জায়গায় ইনভেস্ট করলে সত্যিকার অর্থেই আমাদের ভবিষ্যৎ সিকিউরড হবে। অথচ আল্লাহর সাথে কেউ ব্যবসা করতে চাই না। চাই না আখিরাতে আমাদের জীবনটা সিকিউরড থাকুক। মানুষকে এসব বললে আরও হাসে, কৌতুক করে।

আল্লাহর সাথে ব্যবসা করেছিলেন সাহাবি আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু আনহু। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এক এতিম এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি বাগান আছে, আমি সেই বাগানের চারদিকে দেয়াল দিতে চাই। কিন্তু আমার বাগানের সীমায় আরেক ব্যক্তির একটা খেজুর গাছ পড়েছে যার জন্য আমি দেয়াল দিতে পারছি না। সে খেজুর গাছটি আমাকে বিক্রিও করছে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে লোককে ডাকলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি গাছটি আমাকে বিক্রি করো আমি তোমাকে জান্নাতে একটি গাছের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে গাছের ছায়ায় হাঁটতেও ১০০ বছর সময় লাগবে। কিন্তু সে বিক্রি করল না। এ সময় রাসূলের সাথে ছিলেন আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি রাসূলকে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি গাছটি কিনি তাহলে আমার জন্যও কি জান্নাতে এমন একটি গাছ থাকবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, হ্যাঁ তোমার জন্যও একটি গাছের প্রতিশ্রুতি দিলাম।

আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই লোকের কাছে গিয়ে গাছটি কিনতে চাইলেন। সে জবাব দিল, আমি আল্লাহর নবিকে যে গাছ বিক্রি করিনি এখন সেটা তোমাকে বিক্রি করব? আবু দাহদা বললেন, তুমি কি আমাকে চেনো? লোকটি বলল, তোমাকে কে না চেনে, তোমার বিশাল বাগানের কথা কে না জানে, ৬০০ গাছ, সুমিষ্ট পানীয়, বাড়ি। আবু দাহদা বললেন, তুমি যদি আমাকে গাছটি বিক্রি করো তাহলে আমার পুরো বাগানটিই তোমার। লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি আমার সাথে মজা করছ? আবু দাহদা বললেন, না আমি সত্যি বলছি, তুমি আমার পুরো বাগানের বিনিময়ে গাছটি আমাকে বিক্রি কর।

এই ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জেনে গেলেন। তিনি আবু দাহদাকে বললেন, আমি তো তোমাকে একটি গাছের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি দেখছি তোমার পুরো জান্নাত খেজুর গাছে ভরে গেছে।

আবু দাহদা সেসময় তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন। তাঁর স্ত্রী বাগানে কাজ করছিলেন। আবু দাহদা বললেন, বাগান থেকে বেরিয়ে আসো, এই বাগান আমি জান্নাতের একটি গাছের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছি, যে গাছের ছায়া ধরে হাঁটতেও ১০০ বছর লাগবে। আবু দাহদার স্ত্রী বললেন, কী উত্তম ব্যবসা! কী উত্তম ব্যবসা! ওলামারা বলেন, এরপর আবু দাহদা আর তাঁর স্ত্রী খুব গরীব হয়ে গিয়েছিলেন, এরপরও তারা আনন্দিত থাকতেন তাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের কথা ভেবে। আল্লাহু আকবার!

আজ আমাদের সমস্ত কিছু দুনিয়াকে কেন্দ্র করে। আমাদের ধনসম্পদ, আমাদের সঞ্চয়, আমাদের অট্টালিকা সব দুনিয়াতেই। যে কারণে আমরা কেউ মরতে চাই না, মৃত্যুকে ভয় পাই।

আমরা পুরো একটা জীবন খরচ করি এই দুনিয়ার পেছনে, এই দুনিয়ায় সিকিউরড থাকার পেছনে, আরামে থাকার পেছনে। আমাদের স্বপ্নের প্রাসাদ নির্মাণ হয়েছে এই দুনিয়াতে, আর আখিরাতে আমাদের কিছুই নেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের অর্থ, সম্পদ, সময়, সবকিছু খরচ করেছে আখিরাতে তাদের প্রাসাদ নির্মাণে, যারা আবু দাহদার মতো জান্নাতে বাগান কিনেছে, যারা উমরের মতো জান্নাতে হীরার বাড়ী কিনেছে তারা সবসময় উদগ্রীব থাকে কবে এই দুনিয়া ছাড়বে, কবে তাদের নির্মিত প্রাসাদে যাবে, কবে আখিরাতে তাদের অর্জিত সম্পদ ভোগ করবে।

আল্লাহ যেন আমাদেরকেও আবু দাহদার মতো লাভবান ব্যবসা করার তাওফিক দেন। আমাদের অন্তরগুলোকে যেন আখিরাতের সাথে বেঁধে দেন। আমাদের যেন আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করার, আখিরাতে প্রাসাদ বানানোর তাওফিক দেন। আমীন।

আর এটাই মহাসাফল্য

জাহিল সময়ে যখন মুভি দেখতাম তখন রোমান্টিক ধাঁচের কিছু মুভি থাকত, যেখানে ট্র্যাজিক এন্ডিং হতো। নায়ক, নায়িকা দুইজনই মারা যায়। এধরনের মুভিগুলোতে প্রায়ই শেষে একটা দৃশ্য দেখা যেত...শুভ্র সাদা কাপড়ে নায়ক নায়িকা হেঁটে যাচ্ছে, সবুজ মাঠ কিংবা সুন্দর ফুলের বাগান, তাদের মাঝে ছোট একটা বাচ্চা দৌড়ে যাচ্ছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমুশনাল মিউজিক বাজছে...

পরিচালক এখানে দর্শককে যে মেসেজটা দেওয়ার চেষ্টা করেন সেটা অনেকটা এমন যে, এই পৃথিবীতে তাদের ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি, তারা এখন পরপারে জান্নাতে মিলিত হয়েছে...সেখানে তাদের সুখের পৃথিবী। যদি ভালোভাবে খোঁজ নেন তাহলে দেখবেন যারা এই ছবিগুলো বানায় তাদের বেশিরভাগই ধর্মকর্ম, আখিরাতের ধার ধারে না। কিন্তু মানুষের সেন্টিমেন্ট ধরে রাখার জন্য হোক কিংবা ফিতরাতগত বৈশিষ্টের কারণে হোক, দিনশেষে এই জাহিল মানুষগুলোও বোঝাতে চায় এই দুনিয়া আসলে সবকিছু পূর্ণতা পায় না, এখানে কোনোকিছু পার্ফেক্ট নয়, স্থায়ী নয়। জীবনের এই অপ্রাপ্তি, অপূর্ণতা সবকিছুর জন্য এই জীবনের পরেও কিছু একটা আছে।

আমরা যখন শুনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা খুব কষ্টে আছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, গণহত্যা চলছে, মায়ের সামনে ছোট ছোট বাচ্চাকে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে, বোনেদের ধর্ষণ করা হচ্ছে—স্বাভাবিকভাবেই আমাদের খারাপ লাগে। যখন শুনি কোনো শহর যালিমরা দখল করে নিয়েছে, কিংবা আল্লাহর বান্দারা সেখানে বিপদে আছে—অবশ্যই আমাদের হৃদয়েও রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু সে সাথে মুসলিম হিসেবে আমাদের এটাও স্মরণে রাখা উচিত সফলতা মানে কী, বিজয় মানে কী?

আরশীল আযীম, মালিকীও মিদ্দীন, আর রাহমানের কাছে বিজয় মানে সবসময় সবকিছু দখল করে ফেলা, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করা নয়। সফলতার, বিজয়ের অনেক ক্ষেত্র আছে, অনেক সময় দুনিয়াবি সবকিছু হারিয়েও নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহ আযযা ওয়া যালের কাছে উপস্থিত হলেও সেটা বিজয় হতে পারে।

সাহাবি হারাম বিন মিলহাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন আর বলছিলেন, **কা'বার রবের শপথ! আমি সফল হয়ে গেছি।**

কুরআনে আসহাবুল উখদুদের কথা আছে। অত্যাচারী জালিম রাজা বিশাল পরিখা খনন করে ঘোষণা দিলেন হয় দ্বীন ত্যাগ করো নয়তো আগুনে ঝাপ দিয়ে মরো। মুমিনরা সেদিন আগুনে ঝাপ দেওয়াটাই বেছে নিয়েছিল। সেদিন ঈমানদাররা তাদের ঈমানের দাবিতে অটল ছিল—আগুনের লেলিহান শিখার ভয়াবহ এক ফিতনা সামনে থাকার পরও। বাচ্চা কোলে এক মা ঝাপ দিতে ইতস্তত করছিল, তার কোলের বাচ্চা সেদিন কথা বলে উঠেছিল, ঝাপ দাও মা! ঝাপ দাও! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা এই ঘটনার স্বীকৃতি দিয়েছেন কুরআনের সূরাহ বুরুজে। তিনি বলেছেন,

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

"...এটাই মহাসাফল্য" (সূরাহ বুরুজ, ৮৫:১১)

মুমিনরা সব আগুনে পুড়ে কয়লা হয়েছে, তারপরও আল্লাহ বলেছেন এটাই মহাসাফল্য! কারণ তারা ঈমানের দাবিতে অটল ছিল।

সুতরাং আল্টিম্যাট সফলতা সেটা নয় যা তুমি দুনিয়াতে অর্জন করলে। নিরাপদে, নিশ্চিন্তে একটা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটিয়ে দেওয়াটাই সবসময় সফলতা নয়। সফলতা হলো আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে জমে থাকা। সফলতা হলো ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী থেকে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়া।

সুতরাং বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন শিশুগুলো সফল হয়ে গেছে। সফল হয়ে গেছে শাহাদাহ উচ্চারণ করতে করতে জীবন্ত পুঁতে ফেলা ঐ ভাই, সফল হয়ে গেছে ধসে পড়া দেয়ালের নিচে চাপা পড়া ঐ আপাদমস্তক হিজাবী বোন, যে চায়নি মৃত্যুর পরও তাকে কেউ বেপর্দা অবস্থায় দেখুক। সফল হয়ে গেছে আল্লাহর সেই বান্দারা যারা মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো আল্লাহর ক্বদরের উপর ধৈর্য

ধরেছে। সফল হয়ে গেছে তারা, যাদের তাজা রক্তে ভিজেছে এই বিবর্ণ জমিন। মুনিনদের হারানোর কিছু নেই। ভালো সময়, খারাপ সময়, সবকিছুতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বরকত, রহমত। সুবহানআল্লাহ!

> "মুমিনের অবস্থা কতই না চমৎকার! তার সব অবস্থাতেই কল্যাণ থাকে। যদি তার সাথে ভালো কিছু ঘটে, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। আবার যদি তার সাথে খারাপ কিছু ঘটে, সে ধৈর্যধারণ করে, যা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এটি বিশ্বাসী (ঈমানদার) ছাড়া কারও সাথেই ঘটে না।"[২৪]

তাই আমরা যখন দেখি আমাদের মুসলিম ভাই বোনেদের আল্লাহ পরীক্ষা নিচ্ছেন, —ঈমানের পরীক্ষা—সত্যবাদিতার পরীক্ষা; যখন তাদের উপর যুলুম দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, চোখের সামনে প্রিয়জনের ছিন্নভিন্ন দেহ দিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে, সম্মান ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে... তখন সর্বপ্রথম আমাদের কাজ হলো আল্লাহর দ্বীনের দিকে ফিরে আসা। যে ফিতনার মধ্য দিয়ে আমাদের ভাই বোনেরা যাচ্ছে, সে ফিতনা একদিন আমাদের দিকেও ধেয়ে আসবে, তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

আর হ্যাঁ, সফলতা দুনিয়ার সবকিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে বেচে দেওয়া কিংবা এই দ্বীনকে কম্প্রমাইজ করার নাম নয়। সফলতা হলো আল্লাহর দ্বীনের উপর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকা, যদিও সেজন্য দুনিয়ার সবকিছু হারাতে হয়। আমরা ইয়াকীনের সাথে বিশ্বাস করি উম্মাতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ অবশ্যই বিজয় দান করবেন, তবে সেটা কোনোরকম কুরবানী ব্যতিরেকেই হবে, আল্লাহর দ্বীন নিঃসন্দেহে এতটা সস্তা নয়। অবশ্যই আল্লাহ প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিমকে সেইসব পরস্থিতির মধ্যে ফেলবেন যখন আমাদেরকেও অপশন দেওয়া হবে হয় ঈমান, না হয় দুনিয়া। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন ঈমানের দাবিতে সত্যবাদি কারা।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

> "মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সকলকেই পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা

---

[২৪] সহিহ মুসলিম: ২৯৯৯

অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক।" (সূরাহ আনকাবুত ২৯:২-৩)

অবশ্যই ফিতনা আসবে, পরীক্ষা সন্নিকটেই। সেদিনের জন্য প্রস্তুতি আর হক্কের উপর টিকে থাকার কাকুতি মিনতিই আমাদের মূল করণীয়। কেননা নিশ্চয় ইয়াউমাল কিয়ামাহর দিনটি সত্য, আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার দিনটি সত্য। আল্লাহর কসম, এই দিনটি সত্য।

প্রচণ্ড এক উত্তাপের দিনে

খুব গরম। বাইরে বেরোলেই ঘেমে নেয়ে একাকার। আসরের পর থেকেই আশা করে ছিলাম বৃষ্টি হবে। নামায পড়ে রাস্তায় একটু হাঁটছিলাম আর তখনই খেয়াল করলাম গায়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু তখনও আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত। রাস্তার পাশের এক টং দোকানে চা খেতে গেছি। কিছু ইয়ো ইয়ো টাইপ ছেলেপিলেও ছিল, খাওয়া দাওয়া করছিল, আড্ডা দিচ্ছিল। একজন গরমের উপর চরম বিরক্তি প্রকাশ করল। আর তখনই খেয়াল করলাম দোকানদার তারচেয়েও বেশি বিরক্তি নিয়ে বিড়বিড় করছে—"খালি গরমরে গালি দিলে হইব? নামায নাই কিছু নাই, হাফ প্যান্ট পইরা ঘুরব আর গরমরে গালি দিব। তুগো উপর গরম আইব না তো কী আইব?"

সময়ের কাঁটা যতই ঘুরছে ততই আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে দুইটা দল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ধৈর্য, তায়াক্কুল, শুকরিয়া নিয়ে একটি দল আল্লাহ্‌র দ্বীনের পথে অবিচল থাকার প্রাণান্তর চেষ্টায় রত। আর অন্যদিকে আরেকটি দল নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে বেছে নিয়েছে, যে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য মহান রবের প্রতি অকৃতজ্ঞতায়, দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনে, পাপাচারে। আর যখন নিজেদের প্রবৃত্তিপ্রসূত দ্বীন বেকায়দায় পড়ে, তখন নাখোশ হই ঠিকই আল্লাহ্‌র উপর! সমাজে অশ্লীলতা, ব্যভিচার, যুলুম, অন্যায়ের সরাইখানা বানিয়ে ঠিকই অভিযোগ তুলি আল্লাহ্ এটা কেন করল, এটা কেন করে না! মঙ্গল শোভাযাত্রা বানিয়ে, ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে[২৫], পেঁচার কাছে সমৃদ্ধি আশা করে আবার কয়েকটা দিনের অসহ্য গরম সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ্‌র উপর ক্ষোভ ঝাড়ার চূড়ান্ত রকম

---

[২৫] প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে বাঁচতে বৃষ্টির আশায় ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার একটা কুসংস্কার চালু আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও (যেমন-জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) এরকম আয়োজন হতে দেখা গেছে।

বেয়াদব, অকৃতজ্ঞ, গোঁয়ার মানুষগুলো কোন দ্বীন পালন করে তার একটা ফয়সালা করে ফেলে না কেন?

যখন মাগরিবের নামায পড়ছিলাম তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। মসজিদের ছাদ টিনের বলে অদ্ভুত এক শব্দ হচ্ছিল চারদিকে। টিনের ফুটো দিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল কোনো কোনো জায়গায়। নামায শেষে কয়েকদিনের কষ্টের তাপদাহ শেষে এই বৃষ্টির জন্য ইমাম সাহেব বিশেষ দুআ করছিলেন। দেখলাম পাশের মুরব্বি দুআর সাথে আমীন আমীন করছেন আবেগতাড়িত কণ্ঠে। আর আমি হঠাৎ করে ভাবছিলাম টং দোকানের সেই ছেলেগুলোর কথা। আচ্ছা তারাও তো এই বৃষ্টি দেখেছে। তারা কি এর শুকরিয়া আদায় করেছে? তারা কি জানে বৃষ্টির সময় আল্লাহ্ দুআ কবুল করেন?

প্রতিটা দিন আল্লাহ্র নাফরমানিতে ডুবে থাকা মানুষগুলো কি জানে এসব আল্লাহ্র নিদর্শন? যেমনটা আল্লাহ্ কুরআনে শনিবারে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে মাছ ধরা মানুষগুলোকে শাস্তি দিয়ে বলেছিলেন, তিনি এটা করেছেন নিদর্শনস্বরূপ, যাতে এখান থেকে পরবর্তীরা শিক্ষা নিতে পারে।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

"তোমরা তাদেরকে ভালোরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল। আমি বলেছিলাম: তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি।" (সূরাহ বাকারা, ২: ৬৫-৬৬)

তাই প্রকৃতির এই পরিবর্তন, প্রচণ্ড তাপদাহ শেষে প্রশান্তির ঝর্নাধারা—জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ—যারা এখনো আল্লাহ্র দ্বীনের বিষয়ে গাফেল তাদের জন্যও। নিদর্শন তাদের জন্য যারা মুমিনের বিগলিত অন্তরের আন্তরিক দুআকে ব্যাঙের বিয়ের মোড়কে সাজিয়ে আল্লাহ্র রহমতকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। নিদর্শন তাদের জন্য যাদের রব মহান আল্লাহ, রাব্বুল আরশীল আযীম! নিদর্শন তাদের জন্য যারা রাব্বুল ইজ্জতের আদল ও ইনসাফের উপর সন্তুষ্ট।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিনে, সবই হলো নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে। অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হলো আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল।" (সূরাহ ইউনুস, ১০:৬-৮)

সালাত

দাজ্জাল পৃথিবীতে ৪০ দিন অবস্থান করবে, তার একটা দিন হবে এক বছরের সমান, একটা দিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকি দিনগুলো আমাদের অন্যান্য দিনের মতোই।

এই বর্ণনা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। রূপকথার গল্পের মতো অনেক আড্ডায় এই আলোচনা আমি শুনেছি। সেই ৪০ দিনে আমরা কী করব, কেমন হবে, সত্য মিথ্যা মিশিয়ে একেক জন যেন হরর মুভির স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলছে। কিন্তু সাহাবিরা যখন আল্লাহর রাসূলের কাছে শুনছেন, দাজ্জাল ৪০ দিন অবস্থান করবে, এক দিন হবে এক বছর, এক দিন হবে এক সপ্তাহ.....তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

হাদিসটা সহিহ মুসলিমে বর্ণিত। সাহাবিরা সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যেদিন এক দিন এক বছরের সমান হবে, সেটাতে এক দিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, বরং তোমরা এদিন হিসাব করে তোমাদের দিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেবে।"

সুবহানআল্লাহ! কাদের প্রায়োরিটি কী সেটা সাহাবিদের প্রশ্ন দেখলেই বোঝা যায়। আল্লাহর রাসূল একের পর এক দাজ্জালের ফিতনা নিয়ে বলে যাচ্ছেন। আর সাহাবিদের কনসার্ণ সে সময় তারা সালাত কীভাবে আদায় করবে!

আরেকবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে দেখলেন বাম হাতে খাবার খাচ্ছেন। তিনি গিয়ে লোকটিকে বললেন, ডান হাতে খাও। লোকটার কোনো ভাবান্তর হলো না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বারবার তাকে তাগাদা দিয়েই যাচ্ছেন বাম হাতে না খেতে। শেষে লোকটা দেখাল যে তার ডান হাত নেই, কাটা।

কারও হাত নেই দেখলে আমাদের মনে প্রথম চিন্তা কী আসে? সে কীভাবে খায়, কীভাবে টয়লেট করে, কীভাবে কাপড় পরে, কীভাবে লেখে ইত্যাদি। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রথম প্রশ্ন ছিল, তুমি সালাতের জন্য ওযু করো কীভাবে?

সুবহানআল্লাহ! এটাই ছিল সাহাবিদের প্রায়োরিটি—সালাত। তারা আল্লাহকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তাই আল্লাহও তাদেরকে জমিনে সম্মানিত করেছেন, কতৃত্ব দান করেছেন। আর আজ আমাদের প্রায়োরিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই আমাদের উপর জিল্লতি (অপমানের জীবন) চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যে উম্মাতের মসজিদে ফযরের সালাতে দুই কাতার মুসল্লি হয় না, সে উম্মাতের উপর আল্লাহর সাহায্য কীভাবে আসবে? আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবিদের মতো আমাদের জীবনের প্রায়োরিটি ঠিক করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বুঝলিনা জীবন কারে কয়...

রুবেল বড়ুয়া! চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে আমরা একই সেকশানে পড়তাম। কলেজে ভর্তি হয়েই প্রথমে যে কয়জন ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয় রুবেল বড়ুয়া তার একজন। প্রায়ই আমরা একসাথে বসতাম। খুব সুন্দর গানের গলা ছিল তার। কলেজ জীবনের শুরুতেই মিনারের ডানপিঠে এ্যালবামটা খুব জনপ্রিয় হয়। রুবেল বলত ওর মতো গলায় সফটওয়ার বসালে এরকম গান আমি গণ্ডায় গণ্ডায় গাইতে পারি। আমার এখনো মনে আছে সে টেবিলে আঙ্গুলের ঠোকা দিয়ে 'জানি তুই আমার সাথে একলা পথের পথিক হয়ে গাইবি না গান' গানটা খুব সুন্দর গাইত। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের মিড টার্মে আমি ফিজিক্সে ফেল করলাম। কেমিস্ট্রি পরীক্ষার দিন স্যার পাশের জনের সাথে কথা বলেছিল বলে রুবেলের খাতার কিছু উত্তর কেটে দিল। বেচারা কেমিস্ট্রিতে ফেল করল। এরপর একদিন শুনলাম প্রাইভেট পড়তে গিয়ে রুবেল আর বাসায় ফেরেনি, নিখোঁজ! দুই তিন দিন পর তার খোঁজ মিলল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল রুবেলের লাশ! জানি না কী এক অভিমানে, কী এক কষ্টে, কী হতাশায় কিংবা না পাওয়ার বেদনায় রুবেল ছেলেটা সুইসাইড করল। আর আমিও জীবনে প্রথম খুব কাছ থেকে দেখা একজনকে জানলাম, যে সুইসাইড করেছে।

শাইখ আরেফির লেখা 'Enjoy Your Life' বইটার শুরুতে শাইখ বলেছেন ছোটবেলায় ডেল কার্নেগীর লেখা বই তাকে কী পরিমাণ অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু তিনি ভীষণ অবাক হলেন মানুষকে জীবনে সফলতার পথ দেখানো, জীবন উপভোগের কারিকুলাম শেখানো ডেল কার্নেগী নিজেই মরেছে সুইসাইড করে।

যারা গ্রামে থাকেন বা মাঝে মাঝে গ্রামে যান, একদিন সময় করে অন্ধকারে জোনাকি পোকা দেখবেন। দেখে মন হবে ইশ, কী ক্ষমতা এই পোকার! অন্ধকারে আলো জ্বালতে পারে! কিন্তু মজার বিষয়টা হচ্ছে দিনের আলোতে জোনাকি পোকাদের খুঁজে পাওয়া যায়না, আর তাদের কথা কেউ মনেও রাখে না। ঠিক

যেমনিভাবে বহু আকাঙ্ক্ষিত জোছনা ছড়ানো চাঁদের কথা দিনের আলোতে কেউ মনে রাখে না। যাদের দেখে এই দুনিয়ায় আমরা অনুপ্রেরণা খুঁজি, সফলতা খুঁজি, যাদের আমরা রোল মডেল ভাবি—সেই মানুষগুলো অন্ধকারে জোনাকি পোকার মতো। তাদের সাময়িক আলো দেখে ঈর্ষা হবে খুব, কিন্তু সত্যের আলো যেদিন স্পট হবে এরা জোনাকি পোকার মতো অর্থহীন হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে! আর এসকল জোনাকি পোকার পেছনে ছুটতে ছুটতে একসময় যখন সত্যের আলো এসে পড়ে, যখন দুচোখের রঙিন পর্দা খসে পড়ে, যখন সামনের অনুকরণীয় মানুষগুলো আর তাদের দেখানোর জীবনের মন্ত্র মরুভূমির মরীচিকার মতো ভ্যানিস হয়ে যায়, তখন মানুষ দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আশাহত মানুষ তখন জীবনের কোনো দিশা খুঁজে পায় না। 'কী হবে এই জীবন রেখে' 'I quit' 'বিদায় হে পৃথিবী' হয় তখন আশাহত মানুষগুলোর সান্ত্বনার সমাধান!

মানুষ যখন কৃতজ্ঞতা, শোকর, আনুগত্য এই বিষয়গুলো থেকে বিচ্যুত হয় তখন মানুষের ভেতর অহংকার, অবাধ্যতা আর অকৃতজ্ঞতা এসে ভর করে। সে কখনো নিজের অবস্থান নিয়ে সুখি হয় না। তার শুধু চাই আর চাই। দুনিয়াময় একটা জীবনের দুনিয়া অর্জনের যুদ্ধ। সাইকেল পেলে বাইক চাই, বাইক পেলে এবার গাড়ী চাই, গাড়ী যখন হলো এবার তবে আরও একটা গাড়ি, আরেকটা ব্র্যান্ড। এভাবে চাইতে আর পেতে পেতে একসময় মানুষ চাওয়ার কিছু পায় না। তখন মনে আধ্যাত্মিক কিছু খটকা লাগে। জীবনের কোনো উদ্দেশ্য সে খুঁজে পায় না। সে বুঝে উঠতে পারে না এই পৃথিবীতে সে আসলে করছেটা কী! সুখের জীবন তখন তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় মৃত্যুর দিকে! নিজের তৈরি করা সুখের জীবনে নিজেই বেজার হয়ে অনেকেই বেছে নেয় "আত্মহত্যা"!

এত সস্তা জীবন? এতই অর্থহীন? পছন্দের মানুষটিকে পেলে না বলে দুইজনই গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লে? ভাবলে বিরাট কিছু করে ফেলেছ? কোন জীবনের উপর অভিমান করছ? তোমরা তো জীবন কী সেটাই বোঝোনি! A+ না পাওয়ায় আত্মহত্যা করা ছোট্ট মেয়েটার কাছে A+ পাওয়াটাই ছিল সবকিছু! শেয়ার বাজারে লস দিয়ে আত্মহত্যা করা মানুষগুলো! টাকাসর্বস্ব জীবনের গল্পগুলো এর চেয়ে সুন্দর যে হয় না! খ্যাতির পেছনে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে ওঠা জিয়াহ খান, দিব্যা ভারতী, সুশান্ত সিং রাজপুত কিংবা মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করা আশা ভোশলের মেয়ে! আফসোস! যে জীবনের স্বপ্ন তারা আমাদের দেখায় সে জীবনের কাছে তারা নিজেরাই পরাজিত! মানুষগুলো একবারও ভাবে না। একবারও ভাবে না এই জীবনের একটা অর্থ আছে। সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা উদ্দেশ্য আছে। একবারও কেউ বুঝতে চায় না জীবন আসলে কী...

ভাগ্য! তাকদীর! দুনিয়ালোভী মানুষগুলোর খুব ক্ষোভ এই তাকদীরের উপর! ভালো কিছু পেলে তো হলোই, না হলে সব ভাগ্যের দোষ! জীবনে খারাপ কিছু ঘটলে তাকদীরকে দোষারোপ! অমুকের এটা ওটা আছে আমার কেন নেই, অমুক ধনী আমি কেন ফকির! একবার এক ছোট ভাই এসে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাইয়া! মানুষের সবকিছু যদি আল্লাহ নির্ধারণ করে থাকেন, আমি যা করব তার সবকিছু যদি আল্লাহ আগেভাগেই ঠিক করে রাখেন তাহলে আমি যদি এখন সুইসাইড করি সেটাও তো আল্লাহ ঠিক করেছেন। তাহলে আমার পাপ হবে কেন?" এধরনের প্রশ্নগুলো অমুসলিমরাও সবসময় করে। আর এই প্রশ্নগুলো দিয়ে শয়তান মানুষকে ফাঁদে ফেলে ঈমানকে হালকা বানিয়ে ফেলে।

সহজ কথায় তাকদীরের বিষয়টা আল্লাহ নিজের হাতে রেখেছেন এবং এর ব্যাপারে মানুষকে জানাননি। এটা আল-গায়েব। আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিস্কে এর সম্পর্কে জানাও সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের তাকদীর নিজের হাতে রেখেছেন এবং তিনি যা চান তাই হবে কিন্তু মানুষকে পছন্দ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলছেন,

> "বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। (সূরাহ কাহাফ, ১৮:২৯)

> "আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।" (সূরাহ ইনসান, ৭৬:৩)

> "অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" (সূরাহ আশ-শামস, ৯১:৮-১০)

বলা হয় যে, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক লোক এসে বলছিল, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, এটা একটা সমুদ্রের মতো, একবার নামলে কূল খুঁজে পাবে না (অর্থাৎ মানুষের পক্ষে সাঁতার কেটে সমুদ্রের অপর পারে পৌঁছানো অসম্ভব। তেমনি সীমিত জ্ঞান নিয়ে গায়েব পরিপূর্ণভাবে বোঝাও অসম্ভব)। লোকটি তারপরেও বারবার একই দাবি করতে থাকল। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে বললেন, তোমার একটা পা তোলো। লোকটি এক পা তুলল। তাকে বলা হলো, এবার আরেক পা তোলো। লোকটা বলল, এটা তো সম্ভব না। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোলার চেষ্টা করো ভালোভাবে।

লোকটি বলল, চেষ্টা করলেও সম্ভব না। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—এটাই হচ্ছে তাকদীর।

খেয়াল করার বিষয়, এটা একটা বাস্তবতা যে মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন দুই পা একই সাথে মাটি থেকে ওপরে তোলা তার জন্য অসম্ভব। আবার একটা পাখির জন্য সম্ভব। এখন, আমরা আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে যতই চেষ্টা করি না কেন, যে জ্ঞানটা (গায়েব) আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছ থেকে আড়াল করেছেন সেটা আমরা কোনোভাবেই বুঝতে পারব না।

এবারে আসি তাকদীর ও ইচ্ছাশক্তির বিষয়ে। প্রথম পা ওঠানোর সময়

(১) লোকটির ইছা শক্তি ছিল,

(২) লোকটির চেষ্টা ছিল,

(৩) আল্লাহর ইচ্ছা/অনুমতি ছিল। সুতরাং কাজটি করা গেছে।

দ্বিতীয় পা ওঠানোর সময়

(১) লোকটির ইচ্ছা ছিল,

(২) লোকটির চেষ্টাও ছিল।

(৩) কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা/অনুমতি ছিল না। তাই সে করতে পারেনি।

সব কাজের ক্ষেত্রেই এই তিনটি বিষয় জড়িত। এর মধে তৃতীয়টা, যেটা আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেটা নিয়ে কারোরই কিছু করার নেই। আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দেবেন বা পুরষ্কৃত করবেন প্রথম দুটোর জন্য। কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ করছে তখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দিয়েছেন খারাপ কাজ করবার, আল্লাহ না চাইলে সে তা করতে পারত না। তবে এর সাথে তার নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং চেষ্টা জড়িত। সেটার জন্য সে শাস্তি পাবে। ভালো কাজের জন্যও একই কথা।

মোটকথা, তাকদীর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি-জ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারব না—সেটা নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের কাজ না, কেননা এটা গায়েব। আমাদের সামনে ভালো ও মন্দ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এখন আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং চেষ্টার জন্য আমরা দায়ী থাকব। সেটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে।

আমাদের এদিকে একটা ডায়লগ প্রচলিত আছে, সময় ভালো না গেলে মানুষ বলে—জীবনটা তেজপাতা হয়ে গেল। যাদের চা বানানোর অভ্যাস আছে তারা

জানবেন রং চা বানানোর সময় তেজপাতার একটা ব্যবহার আছে সুগন্ধ আনার জন্য। এমনি তেজপাতা খুব একটা সুগন্ধ ছড়ায় না কিন্তু ফুটন্ত পানিতে তেজপাতা ছেড়ে দিয়ে দেখুন তো! এক মনজুড়ানো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। মানুষও এই তেজপাতার মতো! আর মানুষের জীবনের দুঃখকষ্ট, পরীক্ষা, বিপদাপদ এসব ফুটন্ত পানির মতো। এই ফুটন্ত পানিতে নামলে তবেই জীবনের সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে। জীবনের আসল স্বাদ বোঝা যাবে। জীবনটা তো তেজপাতাই, কিন্তু তার সুঘ্রাণ পায় কয়জন?

আল্লাহ আমাদের কাউকে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া এখানে পাঠাননি। সূরাহ আয-যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন সেই উদ্দেশ্যের কথা, **"আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।"**

এছাড়া আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মানুষের কর্মপন্থা ঠিক করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত ও জাহান্নামের কথা। জীবনের মানসিক প্রশান্তি, আত্মার সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, ঘুমানো থেকে পায়খানা প্রশ্রাবের আদব সবকিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। জীবন হলো জন্ম থেকে মৃত্যু। আর এই জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের সময়টাতে আছে আমাদের বাছাই করার সুযোগ! প্রতিটা কাজে, চিন্তায়, উদ্দেশ্যে আমরা কী বেছে নিয়েছি দিনশেষে সেটাই আমাদের জীবনকে সংজ্ঞায়িত করবে। প্রবৃত্তির পূজা করে জোনাকি পোকাদের দেখানো জীবনের পেছনে ছোটার স্বাধীনতা যেমন আমাদের আছে তেমনি আল্লাহর গোলামী করে আখিরাতের প্রতিশ্রুত পাথেয় সংগ্রহের স্বাধীনতাও আমাদের আছে।

জীবনের নানান বাঁকে দাঁড়িয়ে কোনো এক দুর্বল সময়ে সবার মনেই প্রশ্নগুলো জাগবে—জীবন কী? জীবনের উদ্দেশ্য কী? কী করছি আমরা এই দুনিয়ায়? এখান থেকে আমরা কোথায় যাব? যে মানুষটি আল্লাহর গোলামী করে গেছে জীবনভর, সে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানে। আর যারা এর কোনো উত্তর খুঁজে পায় না, বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য তারা খুঁজে পায় না। মৃত্যু তাদের দিকে ধেয়ে আসার আগেই অনেকের কাছে তাই 'সুইসাইড' হয় একটা সমাধান!

আমাদের সালাফদের জীবনীতে এমন কাউকে পাওয়া যায় না যারা জীবনের উপর হতাশ হয়ে, দুঃখে-কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে, ভাগ্যকে দোষারোপ করে সুইসাইড করেছেন। কারণ একজন মুসলিম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে বেঁচে থাকে আর আল্লহকে সন্তুষ্ট করতে মরে। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে মানুষ কৃতজ্ঞ চিত্তে

আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহর জন্য জীবন অতিবাহিত করে—আল্লাহ তার সাথে অবিচার করবেন না কোনোদিন। একজন মুসলিম জানে আল্লাহর হুকুম পালনেই কল্যাণ আর আল্লাহর হুকুম থেকে বিচ্যুত হওয়াতেই অকল্যাণ।

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

> "... কিন্তু তোমরা কোনোকিছু অপছন্দ কর সম্ভবত তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর এবং সম্ভবত কোনোকিছু তোমাদের কাছে প্রিয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই ভালো জানেন তোমরা তা জানো না।" (সূরাহ বাকারা, ২:২১৬)

তাই বেঁচে থাকতে শিখুন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর রহমত আর হিদায়াত থেকে নিজের জন্য কিছু সংগ্রহ করুন। আল্লাহ যতক্ষণ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ধরে নিন ততক্ষণ আপনার অনেক কিছু করার আছে। প্রচুর অক্সিজেন এখনো আছে নিশ্বাস নেওয়ার। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্য কিছু সময় আছে। জীবন শেষ করে দেয়াটাই যদি সমাধান হতো তাহলে মানুষের তো জন্ম নেওয়ারই কোনো দরকার ছিল না ভাই।

অনেক সময় আসবে যখন জীবনটা অর্থহীন মনে হবে। মনে হবে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। অনেক সময় আসবে যখন চাওয়া আর পাওয়াগুলো মিলবে না। মনে করুন আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে আপনাকে বাছাই করেছেন ঈমানের পরীক্ষায়! এখানে জীবনের উপর দোষারোপ করে শয়তানের হাসির পাত্র হবেন না। আপনার স্বপ্নগুলো বড় করতে থাকুন। পরীক্ষায় ভালো করেননি বলে, ভালো চাকরিটা পাননি বলে, খ্যাতি আপনার হাতে ধরা দেয়নি বলে সুইসাইড করে মনে করছেন জ্বালা মিটিয়েছেন? আসলে আপনার জীবন ছিল অতটুকুই। আপনি কোনোদিন এর বাইরে ভাবতে পারেননি।

পৃথিবীটা অনেক সুন্দর ভাই। অনেককিছু করার আছে এখানে আপনার। জীবনটা শেষ করে দেবেন? তাতে কি আপনার না পাওয়াগুলো পূরণ হবে? আক্ষেপগুলো মিটে যাবে? তার কিছুই হবে না। যেটা হবে আপনি কোনোদিন এই সুন্দর পৃথিবীতে আর ফিরে আসতে পারবেন না। আর কোনোদিন সকাল বেলার রোদ দেখে চিৎকার করে উঠতে পারবেন না। আর কোনোদিন ঝুমবৃষ্টিতে হৈ চৈ করতে পারবেন না। আর কোনোদিন মন খারাপ করে কাঁদতে পারবেন না। কোনোদিন প্রিয় স্ত্রীর হাত ধরে সমুদ্র সৈকতে হাঁটতে পারবেন না। রমযানের সেহেরি

ইফতারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে পারবেন না। আর কোনোদিন ঈদের নামায পড়ে বাবা-মা'কে সালাম করে সেলামি নিতে পারবেন না। কোনোদিন আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে পারবেন না, আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে পারবেন না। আর কোনোদিন আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে এই পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছে আপনার পূরণ হবে না। কোনোদিন না!

কী? ন্যাকামু মনে হচ্ছে? সস্তা আবেগ মনে হচ্ছে? একবার মরে গিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝবেন এই আবেগগুলো কত দামি! এই আবেগগুলোর মতোই দামি আপনার জীবনটাও। আল্লাহর নির্ধারিত সময় ফুরানোর আগেই জীবনের অর্থটা তাই খুঁজে নিন।

'তাঁর ইহসানগুলো আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।'

বদরের প্রান্তর। এই প্রথম বারের মতো হক্ক আর বাতিল দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। তুমুল লড়াই শুরুর আগে এক সাহাবি প্রস্তাব রাখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যেন আলাদা একটা জায়গা বানিয়ে রাখা হয় এবং রাসূলকে পাহারা দেওয়ার জন্য যেন একজন নিয়োজিত থাকে। সেদিন যখন ডাক দেওয়া হলো কে আছো যে প্রিয় নবিকে পাহারা দেবে? আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেদিন এক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া এই সাহস কেউ দেখাতে পারেনি।

যুদ্ধ চলছে। আবু বকর কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেন আবার এসে রাসূলকে পাহারা দেন। যুদ্ধের মধ্যে একবার তিনি দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে দুআ করছেন, কান্নাকাটি করছেন। এর মধ্যে রাসূলের কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছিল। আবু বকর যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটে গেলেন। চাদরটা ঠিকঠাক করে দিলেন। আর রাসূলকে বললেন, আপনি কেন এত পেরেশান হচ্ছেন, নিশ্চয় আপনার দুআ ব্যর্থ হবে না।

ইনি আমাদের আবু বকর, যুদ্ধের ময়দানে বাঁচবে কি মরবে তার ঠিক নেই, এই সময়ও রাসূলের কাঁধ মুবারক থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছে, এটা তিনি সহ্য করেননি। আর আজ সেই রাসূলের শানে আঘাত হয়, সেই রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ হয়, গালিগালাজ হয়, সেই রাসূলের চরিত্র হনন করা হয়, আর আমরা...

সবাই হিজরত করে ফেলেছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন কিন্তু নবিজি বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করো না, আল্লাহ হয়তো তোমার জন্য একজন সঙ্গী ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই থেকে আবু বকর ধারণা করলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হয়তো তাকেই নেবেন সঙ্গী হিসেবে। তিনি দুটো উট কিনলেন, খাইয়ে দাইয়ে মোটাতাজা করলেন। এরপর থেকে তিনি সবসময় অপেক্ষায় থাকতেন কবে আসবে সেই ডাক। যেদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে আবু বকরকে হিজরতের সঙ্গী হওয়ার সুসংবাদ দিলেন, সেদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোট বাচ্চার মতো অঝোরে কাঁদছিলেন। আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এর আগে আমি জানতাম না আনন্দের আতিশয্যে মানুষ এভাবে কাঁদতে পারে।

ইনি আমাদের আবু বকর, রাসূলের সাথে কঠিন পথের সাথী হতে পেরে, রাসূলের সবচেয়ে কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থাকতে পেরে, তাঁর সেবা করার সুযোগ পেয়ে তিনি কাঁদছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সকল ঘোড়াই কোনো না কোনো সময় হোঁচট খায়, সেটা যত ভালো ঘোড়াই হোক না কেন। কিন্তু আবু বকর এমন এক ঘোড়া যে কখনো হোঁচট খায়নি, অর্থাৎ সে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। রাসূল বলেন, আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সবাই একটু না একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু যখনই আমি আবু বকরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি সে সাথে সাথেই বলেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

উসামার বাহিনী মদিনা ত্যাগ করার আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন। এরপর অনেকেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উসামার বাহিনী ফেরত আনার পক্ষে মত দেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বজ্রকঠোর মানুষটি পর্যন্ত বলেন, "হে খলিফাতুল মুসলিমীন! এখন জোর জবরদস্তির সময় নয়, যতদূর সম্ভব নম্রতা দেখিয়ে অন্তর জয় করার সময়।" জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, "উমর! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তুমি কঠোর প্রকৃতির ছিলে। ইসলাম গ্রহণের পর এতই নম্র হয়ে গেলে? মনে রেখো, ইসলাম সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। আমার জীবনে ইসলাম পঙ্গু হয়ে যাবে এটা আমি কোনোমতেই সহ্য করব না। আল্লাহর কসম! আমার গোশত যদি পশু পক্ষীরাও খেয়ে ফেলে, তবুও আমি সেই বাহিনীকে নিশ্চয়ই প্রেরণ করব, যাদেরকে রওনা দেওয়ার জন্য স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।"

উসামার বাহিনী রওনা হওয়ার সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি উসামার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন, "হে খলিফাতুল মুসলিমীন! আপনি পায়ে হেঁটে আমাকে লজ্জিত করবেন না। আপনিও সওয়ারিতে

উঠে বসুন, নইলে আমিও নিচে নেমে আসব।" জবাবে তিনি উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঘোড়ায় বসে থাকার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহর রাস্তায় কিছুদূর পর্যন্ত আমার পায়েও ধুলোবালি লাগতে দাও। কেননা, গাযীদের প্রত্যেক কদমে সাত শত নেকী লেখা হয়।"

ইনি আমাদের আবু বকর, তিনি যেমন কোমল ছিলেন তেমনি আল্লাহর দ্বীনের উপর কোনো আঘাত আসলে সেখানে ছিলেন ইস্পাতের মতো কঠিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যখন অনেকেই যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তখন আবু বকর বলেছিলেন, আল্লাহর রাসূলের সময় যারা একটা বাছুরও যাকাত দিত, আজ যদি কেউ সেটাও দিতে অস্বীকার করে আমি আবু বকর তার বিরুদ্ধে জিহাদ করব।

তাবুক যুদ্ধে যখন সবাই একে একে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় দান করছিল, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সম্পদের অর্ধেক দিয়ে ভাবছিল যাক, আজকে অন্তত আবু বকরকে আল্লাহর সাথে ব্যবসায় পেছনে ফেলতে পারলাম। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখল, আবু বকর এসে তার সমস্ত সম্পদই আল্লাহর রাসূলের সামনে হাজির করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? জবাবে আবু বকর বলেছিলেন, তাদের জন্য আল্লাহ এবং তার রাসূলই যথেষ্ট।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক ধনসম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছিলেন। অত্যন্ত হতদরিদ্র এবং সাধারণ জীবন যাপন করতেন। একবার আমীরুল মুমিনীন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর স্ত্রীর মিষ্টি খাওয়ার খুব ইচ্ছে হলো। তিনি স্বামীকে মিষ্টি কিনে আনতে বললেন। সারা মুসলিম জাহানের আমীর আবু বকর জানালেন তাঁর মিষ্টি কেনার সামর্থ্য নেই। আমীরুল মুমিনীনের স্ত্রী এরপর প্রত্যেক দিনের খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে জমা করা শুরু করলেন। কিছু অর্থ জমা হওয়ার পর তা স্বামীকে দিয়ে বললেন মিষ্টি কিনে আনতে। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন এই অর্থ কোথা থেকে এসেছে। স্ত্রী বললেন প্রতিদিনের খরচ থেকে বাঁচিয়ে তিনি এই অর্থ জমা করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, এই পরিমাণ অর্থ তাহলে আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অতিরিক্ত নিচ্ছি? এটার তো তাহলে আমার আর দরকার নেই! এরপর তিনি সেই অর্থ স্ত্রীর জন্য মিষ্টি কেনার বদলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে আসেন। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া দিয়েছেন আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহর সেই বান্দা দুনিয়ার বদলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে বেছে নিয়েছে। সবাই অবাক হয়ে দেখল একথা শুনে সামনে বসে থাকা আবু বকর ছোট বাচ্চার মতো অঝোরে কাঁদছেন। কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও, আবু বকর বুঝেছিলেন, সেই আল্লাহর বান্দা আর কেউ নয়, রাসূল নিজে।

রাসূলের মৃত্যুর পর সবাই পাগলপ্রায় হয়ে গেল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি নিয়ে ছোটাছুটি করছিল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা বলতে পারছিলেন না। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমার ঘরে ঢুকে রইলেন। চারদিকে পাগলপ্রায় অবস্থা। সেদিনও একজন আবু বকর ধীর পায়ে হেঁটে মানুষের সামনে আসলেন, শান্ত কণ্ঠে তিলাওয়াত করলেন আল্লাহর কিতাব,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তাঁর পূর্বেও নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনও আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৪৪)

তিনি আমাদের আবু বকর। সমস্ত উম্মাহ যেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল, আবু বকর সেদিন শোককে এক পাশে রেখে নিজেই একটি উম্মাহ হয়ে গিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার সম্পর্কে বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে আমি সবার ইহসান পরিশোধ করেছি, কিন্তু আবু বকরের ইহসান পরিশোধ করতে পারিনি। কারণ তাঁর ইহসানগুলো এমন তা আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়, তা স্বয়ং আল্লাহ পরিশোধ করবেন।

এজন্যই তিনি আবু বকর। আম্বিয়াদের পর সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এরকম একজন মর্যাদার মানুষ আল্লাহর ভয়ে বলতেন, হায় আমি যদি ঘাস হতাম আর কোনো বকরি এসে আমায় খেয়ে নিত। একই দ্বীন, একই রাসূলের উম্মাত, তারপরও আবু বকর ছিলেন আবু বকর। কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি। আল্লাহর সাথে ব্যবসায় কেউ কোনোদিন তাকে হারাতে পারেনি। জান্নাতের

বাগানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের সাথে হাঁটছেন—এই দৃশ্য দেখার জন্য হলেও একবার জান্নাতে যেতে চাই। তাদের সাথে জান্নাতের বাগানে হাঁটতে চাই। একবার গিয়ে বলতে চাই, আমি আপনাদের দুজনকে কোনোদিন দেখিনি, কিন্তু আমি আপনাদের ভালোবাসতাম, আর জান্নাতে এসে আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।

আল্লাহ যেন কবুল করেন। আমীন।

আগে হালাল ইনকাম পরে হালাল খাবার

অনেক দিন পর চার বন্ধু একসাথে হয়েছে। বাকি তিন বন্ধুর সাথে খালিদের অনেক দিন পর দেখা। আড্ডা চলছে, কে কোথায় কী করছে, চাকরি, ব্যবসা নিয়ে আলোচনা শেষে এবার একসাথে খাওয়ার পালা। এদিকে মুসলিম রেস্টুরেন্ট তেমন একটা নেই, খুঁজে বের করতে হবে। হালাল খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল চার বন্ধু। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক আফগান রেস্তোরার খোঁজ পাওয়া গেল, বড় করে লেখা দেখা যাচ্ছে 'Halal Food'। যাক বাঁচা গেল!

খাওয়া শেষে কাউকে সুযোগ না দিয়ে খালিদ তড়িঘড়ি করে বিলের কাগজটা উঠিয়ে নিল, দ্রুত মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিয়ে দিল। বাকি তিনজন সেটা নিয়ে মজা করতেও ছাড়ল না। অনেকদিন পর খাবার বিল খালিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া গেল। কলেজে পড়ার সময় খাওয়ার পর বিল দেওয়া নিয়ে সে যে কী নাটকটাই না হতো, মজাই লাগত তখন।

বিল দিয়ে সবাই উঠতে যাবে, সেসময় খালিদ শান্ত গলায় বলল—"আমি বিল দিয়ে দিয়েছি, কারণ অনেকদিন পর তোদের সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লেগেছে, তোদের খাওয়াতে চেয়েছি। তবে এটাই মূল কারণ নয়। মূল কারণ হলো আমি হিসেব করে দেখলাম তোদের তিনজনেরই উপার্জন হারাম। তোদের কেউ একজন বিল দিলে খাবারগুলো হারাম টাকা দিয়ে কেনা হতো। তাই আমিই তাড়াহুড়া করে দিয়ে দিয়েছি। একটা কথা জানিস বন্ধু, আমরা হালাল খাবার নিয়ে খুব সচেতন, খুব সিরিয়াস, অথচ যে টাকা দিয়ে খাবার কিনি সেই টাকাটা হালাল কি না—সেটা নিয়ে কারও মাথাব্যাথা নেই। হালাল খাবার তো পরে, আগে হালাল ইনকাম।"

শেষ কবে আপনি প্রিয় নবির জন্য কেঁদেছেন?

একদিন মা আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশ উৎফুল্ল দেখে আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইশার জন্য দুআ করলেন। "হে আল্লাহ আইশাকে মাফ করে দাও। তাঁর অতীতের গুনাহ মাফ করে দাও, তাঁর আগামীর গুনাহ মাফ করে দাও, তাঁর গোপনে করা গুনাহ মাফ করে দাও, তাঁর প্রকাশ্যে করা গুনাও মাফ করে দাও।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআ শুনে আইশা হাসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইশাকে জিজ্ঞেস করলেন,

"আমার এই দুআ কি তোমাকে সন্তুষ্ট করেছে আইশা?'

আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, "এ দুআ শুনে কেউ সন্তুষ্ট না হয়ে পারে?"

আমাদের প্রিয় নবি আইশাকে বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যেক সালাতের মধ্যে আমার উম্মাতের জন্যে এই একই দুআ করি।"[২৬]

যে দুআ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য করেছেন, সেই একই দুআ প্রতি সালাতে তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য করেছেন। আপনার জন্য, আমার জন্য করেছেন। তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

একদিন চলার পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে উঠলেন। সাহাবারা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি আমার ভাইদের জন্য কাঁদছি। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তো আমার সাথী।

---

[২৬] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯/৩৯০; শাইখ শুআইব আরনাঊত ও আলবানি রহ. হাদিসটিকে হাসান বলেছেন

আমার ভাই হলো তারা, যারা আমার পরে আসবে আর আমাকে না দেখেই আমার উপর ঈমান আনবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার জন্য কেঁদেছেন, আপনাকে মিস করেছেন, আপনি এই দুনিয়াতে আসার আগেই। আপনি কখনো প্রিয় নবিকে মিস করেছেন? কেঁদেছেন কখনো? যে নবি আপনার জন্য প্রতি ওয়াক্ত সালাতে দুআ করতেন সেই নবির নামে আবেগে আপ্লূত হয়ে দরুদ পড়েছেন কোনোদিন? ভালোবেসে কোনোদিন তাঁর একটা সুন্নাহ পালন করেছেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন, তখনও মিম্বর তৈরী হয়নি। পরের সপ্তাহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, সাহাবারা বলেন, সেই গাছটি শিশুর মতো অঝোরে কাঁদছিল, সেই কান্না তারা শুনতে পেয়েছেন।[২৭] একটি গাছও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিস করেছে, তাঁর জন্য চোখের পানি ফেলেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আর আযান দিতে পারেনি। যে নবির জন্য তিনি আযান দিতেন, সেই নবিই নেই, এই দুঃখে এরপর একদিন বিলাল মদিনা ছেড়েই চলে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলালকে বলছেন, এতদিনেও কি তোমার সময় হয়নি আমার রওযায় আসার? ছয় বছর পর বিলাল মদিনায় আসলে সবাই তাকে আযান দিতে অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি মনঃস্থির করেছেন রাসূলের জন্য যে আযান দিতেন তা আর কোনোদিন কারও জন্য দিবেন না। শেষে নবিজির দুই নাতি হাসান-হুসাইন যখন অনুরোধ করলেন, নবিজির সম্মানে তিনি সেই অনুরোধ ফেলতে পারেননি। বিলাল আযান দেওয়া শুরু করলেন। সেই আযান, সেই মধুময় সময়, রাসূলুল্লাহর স্মৃতি সব একসাথে ভেসে আসা শুরু করল। কিছুক্ষণের জন্য মানুষ মনে করল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার ফিরে এসেছেন, মদিনার ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে আসা শুরু করল। বিলাল যখন আযানে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহর জায়গায় এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, পুরো মদিনা জুড়ে হু হু কান্নার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায়নি।

শেষ কবে আপনি আপনার প্রিয় নবির জন্য কেঁদেছেন?

---

[২৭] সহিহ বুখারি: ৩৫৮৪

গৌরবময় ইতিহাসের পাঠ

ফোর্থ ইয়ারে History of Economic Thought নামে আমাদের একটা কোর্স ছিল। মূলত একেবারে শুরু থেকে ইকোনমিকসের ইতিহাস পড়ছিলাম আমরা। শুরু হয়েছিল সেই খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকে—একেবারে এরিস্টটল, প্লেটোর আমল থেকে। স্যার পড়াতে পড়াতে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এসে এক লাফে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে চলে গেলেন। মূলত তিনি ইচ্ছে করে এমনটা করেননি, যেই বইটা পড়াচ্ছিলেন সেখানে এভাবেই আছে। মাঝখানের সময়টা কোথায় গেল জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর দিলেন, আসলে এই সময়টাতে ইকোনমিকসে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমি পাশের ভালো সিজিপিএধারী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে এমনিতে তো অনেক প্রশ্ন করিস, এখন কিছু বলছিস না যে—মাঝের এই সময়টা কই গেল? সে বেশ বিজ্ঞের মতো উত্তর দিল, আসলে এই সময়টা হচ্ছে ডার্ক পিরিয়ড, তাই লেখক এই পার্টটা আলোচনা করেননি। অথচ আমি খুব ভালো করেই জানি এই পশ্চিমা লেখক কেন তার লেখা বইতে এই সময়টা আলোচনা করেনি। কারণ এই সময়টাতে ইসলাম শাসন করেছে।

মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মুসলিম ঘরের বাচ্চাদের ফার্মের মুরগির মতো একটা প্রজন্ম গড়ে উঠছে যারা তাদের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। বিশ-পঁচিশ বছর আগের কিছু নোংরামি আর মূর্তিপূজাকে এদের হাজার বছরের ঐতিহ্য বলে শেখানো হয়, আর তারা তার তালে নাচতে থাকে। আমার খুব ইচ্ছে করছিল জন জন ডেকে ডেকে বলি তোমাদের এই বইটি যে লিখেছে সে ইচ্ছে করেই তোমাদের ইতিহাসটুকু বাদ দিয়েছে। কারণ এই সময়টাতে মুসলিমরা পুরো বিশ্ব শাসন করেছে, অর্থনীতির সোনালি সময় গেছে এই সময়টাতে। এই সময়ে মুদ্রাস্ফীতি ছিল না, এই সময়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়নি, এই সময়ে সম্পদের অসম বণ্টন ছিল না, এই সময়ে শোষক আর শোষিত বলে কিছু ছিল না, এই সময়ে যালিম আর মযলুম বলে কিছু ছিল না। এই সময়ে নিরাপত্তা ছিল, ন্যায়বিচার ছিল।

করোনা মহামারীতে আজ সারাবিশ্বে মানুষ অর্থনৈতিক মন্দায় পড়ে গেছে। চাকরি চলে গেছে, বেতন কমে গেছে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে, আরও কত কী! কিন্তু

এরমধ্যে ধনকুবেররা আরও ধনী হয়েছে। জেফ বেজোস, জ্যাক মা, মার্ক জুকারবার্ক, ইলন মাস্করা ধনী থেকে আরও ধনী হয়েছে। মুকেশ আম্বানি এই লকডাউনের মধ্যেই বিশ্বের দশম শীর্ষ ধনী থেকে চতুর্থ শীর্ষ ধনী হয়ে গেছে। এটাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির আউটপুট। একদল মানুষ ধনী থেকে ধনী হতে থাকে, বাকিরা গরীব থেকে যায়। গরীবরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধনীদের আরও ধনী বানায়। তৈরি হয় ধনী-গরীব, শোষক-শোষিত ইত্যাদি প্রান্তিক শ্রেণী।

ইসলামের এক কুরবানীর ব্যাপারটাই শুধু দেখেন। কুরবানীর দিন সন্ধ্যার পরে গেলে দেখা যাবে যারা কুরবানী দিয়েছে তাদের চেয়ে যারা কুরবানী দেয়নি তাদের ঘরে মাংসের পরিমাণ বেশি। ইসলামের ধনী গরিবের পার্থক্য ঘোচাতে এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ মাত্র। এবার ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ধাপে, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি সেক্টরে এনে দেখেন। সুদভিত্তিক অর্থনীতির জায়গায় ইসলামি অর্থনীতি বসিয়ে দেখেন। যাকাত ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগ করে দেখেন। কাগজে নোটের বদলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবস্থা এনে দেখেন। দেখবেন এই অর্থনৈতিক বৈষম্য আর নেই। অল্প কিছু ধনকুবের মিলে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করার যে মনোপলি, সেই দুষ্টচক্রও ভেঙে পড়বে। একজন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বাগিয়ে নিচ্ছে, আরেকজন না খেয়ে মরছে এমন প্রান্তিক অবস্থান কোথাও থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

অথচ ইসলামের সেই সোনালি যুগটাকেই পুরো ইতিহাস থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করা হয়। সেই যুগকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় পশ্চাৎপদ, ডার্ক পিরিয়ড, বর্বর, সেকেলে যুগ হিসেবে।

এই ডার্ক(!) পিরিয়ডে উমর ইবনুল খত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো নেতা ছিল যিনি বলেছিলেন, ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি চর্ম রোগের মলমের অভাবে কষ্ট পায়, আমি উমরকে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যিনি রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে দেখতেন তাঁর অধীনে উম্মাহর অবস্থা কেমন যাচ্ছে। যিনি এক বাড়িতে উপোষ থাকা আল্লাহর বান্দাদের দেখে কাঁদতে কাঁদতে বায়তুল মাল থেকে নিজের কাঁধে আটার বস্তা বহন করে নিয়ে গেছেন, নিজে তাদের রুটি বানিয়ে, খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে তবেই ঘরে ফিরেছেন। কোনো খাবারের দাম বেড়ে যাওয়ায় যদি সবাই সেটা কিনে খেতে না পারত, তখন উমরও সেটা খেতেন না যতক্ষণ না সবাই সেটা কিনে খেতে পাওয়ার মতো অবস্থায় না পৌঁছায়।

খলিফা উমর বিন আবদুল আযীযের সময়ে মানুষ যাকাতের টাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত, কিন্তু যাকাত দেওয়ার মতো কাউকে পেত না। এসব রূপকথা নয়। এই পৃথিবীতেই এমনটা হয়েছে। আর সেই সময়টাকে এখন বর্বর, মধ্যযুগীয় যুগ বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

এই সময় সাইদ ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো মানুষ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ছিলেন। সিরিয়ার ওয়ালি থাকা অবস্থায় একবার খলিফা উমরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে সেখানকার লোকেরা অভিযোগ করল, তাদের আমীর মাসে একদিন তাদের সামনে আসেন না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সাইদ বলেছিলেন, তার একটি মাত্র জামা। মাসের এই দিনে তিনি তাঁর জামাটি ধুয়ে দেন, সেটি শুকাতে দেরি হয় বলে তিনি এই দিন মানুষের সামনে আসতে পারেন না। তার জবাব শুনে খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অঝোরে কেঁদেছিলেন।

এই সময়ে জনগণের সম্পদ মেরে খাওয়ার মতো কেউ ছিল না। এই সময়ে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় থেকেও তনুরা[২৮] ধর্ষিত হয়নি। বরং উমরের আমলে নিরাপত্তার অবস্থা এমন ছিল, কোনো সুন্দরী নারী যদি সজ্জিত হয়ে মাঝরাতে রাস্তা দিয়ে একাকী হেঁটে যেত, তার মনেও আল্লাহ এবং পশুপাখির ভয় ছাড়া আর কোনো ভয় ছিল না। এক মুসলিম বোনের হিজাব ধরে টান দেওয়ায় তার ইজ্জতের সম্মানে পুরো সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবির মতো মানুষরা ছিল যিনি কোনোদিন হাসতেন না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, কী করে আমি হাসতে পারি যখন জেরুজালেম এখনো ইহুদিদের দখলে। এই সময়ে মুসলিমরা আন্দালুসে শাসন করেছে, জেনে নিও কেমন ছিল সেই গৌরবোজ্জ্বল সময়গুলো।

আফসোস আমাদের জন্য, আমাদের এই প্রজন্মের জন্য, যারা তাদের ইতিহাসের ছিটেফোঁটাও জানে না। যাদেরকে স্কুলের বইতে পড়ানো হয় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গণতন্ত্রমনা ছিলেন। প্রশ্নপত্রে সানি লিওনের প্রসংগ থাকে। আমাদের প্রজন্মকে তাদের গৌরবময় ইতিহাসের পাঠ দেওয়া আপনার আমার দায়িত্ব। তাদের উপর একটু রহম করুন। তাদেরকে এভাবে মেরুদন্ডহীন নখদর্পহীনভাবে বড় হওয়া থেকে হিফাযত করুন।

---

[২৮] তনু কুমিল্লা সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী, ২০১৬ সালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর তার লাশ পাওয়া যায়। পরে জানা যায় তাকে গণধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল। সেই মামলার আজ অবধি কেউ গ্রেফতার হয়নি, মামলারও কোনো সুরাহা হয়নি।

আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়া।

তাবুক যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে প্রায় সকলেই অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে পেছনে পড়ে ছিলেন কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো সাহাবি। সেসময়ের অবস্থা বর্ননা করতে গিয়ে তিনি বলেন, যখনি তিনি বাজারের দিকে যেতেন তখন খুব কষ্ট লাগত কারণ সেখানে সমাজের সবচেয়ে কপট লোকগুলো আর শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গরা ব্যতীত আর কাউকে দেখতে পেতেন না। এতে তাঁর মনোবেদনা আরও বেড়ে যেত এই ভেবে যে, মুমিনরা সব আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে আর তিনি এসব কপট আর শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সাথে পেছনে পড়ে আছেন।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'ব ইবনু মালিকসহ মুরারাহ ইবনু রাবা এবং হিলাল ইবনু উমাইয়া আল ওয়াকেফি—যারা বদরি সাহাবি ছিলেন—তাদেরকেও বর্জনের নির্দেশ দেন। কারণ প্রায় আশি জনের মতো যারা তাবুকে না গিয়ে রয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একমাত্র এই তিনিজনই কোনো অজুহাত দেখাতে পারেননি। বাকী সবাই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের নিফাককে ঢেকে রেখেছিল। কিন্তু এই তিনজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে মিথ্যা বলতে পারেননি।

কেমন ছিল এই তিনজন সাহাবিকে বয়কটের ব্যাপারটা? কেউ তাদের সাথে কথা বলত না, সালামের জবাব পর্যন্ত দিত না। কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাতে সালাত আদায় করতেন এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতেন, কিন্তু কেউ তাঁর সাথে কথা বলত না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতেন, ওনাকে সালাম দিতেন আর সালামের জবাবে ঠোঁট নড়ছে কি না খেয়াল করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে মুখ করে বসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিতেন। তিনি একবার আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়িতে গেলেন। আবু কাতাদা ছিলেন কা'ব ইবনু

মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর চাচাতো ভাই এবং খুব কাছের মানুষ। তিনি আবু কাতাদাকে সালাম দিলেন কিন্তু আবু কাতাদা তাঁর সালামের জবাবও দিলেন না। তিনি আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলতে চাইলেন কিন্তু আবু কাতাদা এমনভাবে আচরণ করলেন যেন তিনি তাকে চেনেনও না। কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে কাঁদতে চলে এলেন।

এরপর সেই তিন সাহাবিকে স্ত্রীদের কাছ থেকেও আলাদা করে দেওয়া হয়। এর পরের ঘটনা হয়তো আমরা সবাই জানি। দীর্ঘ বয়কটের পর আল্লাহ সেই তিন সাহাবির তাওবা কবুল করেন এবং সকলেই দলে দলে তাদেরকে অভিবাদন জানিয়ে আলিঙ্গন করে নেন।

আমাদের আলিমরা এই তিন সাহাবির ঘটনাকে দ্বীনের বিভিন্ন ইস্যুতে টেনে এনেছেন। হাদিস সংকলনে তাওবার আলোচনায় এই ঘটনা আলোচিত হয়েছে। কারণ এই তিন সাহাবি আন্তরিক তাওবা করেছিলেন যা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এর বাইরেও এই ঘটনা থেকে আরও দুটো গুরুত্বপুর্ণ শিক্ষা আমরা পাই যার একটি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে অনাগ্রহী ব্যক্তিবর্গের সাথে উম্মাহর আচরণ কেমন হবে তা, এবং অন্যটি আল্লাহর সাথে সততা।

কা'ব ইবনু মালিক কিংবা অন্য দুই সাহাবি সেসময় জিহাদের বিরোধী ছিলেন না, শুধু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হতে গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত অংশ নিতে পারেননি। সেই অপরাধে পুরো মুসলিম উম্মাহ তাদেরকে বয়কট করেছিল। সুতরাং আজকের যুগের কারও মর্যাদা নিশ্চয় কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর চেয়ে উঁচু হয়ে যায়নি যিনি আকাবার শপথের বারো জনের একজন ছিলেন। আজকের যুগের কারও অবস্থান নিশ্চয় আল্লাহর কাছে বদরি সাহাবিদের চেয়ে উঁচু হয়ে যায়নি। সুতরাং সেসব সাহাবিদের সাথে যদি এমন আচরণ হয়ে থাকে তাহলে আজকের যুগে আমাদের সাথে কেমন হওয়া উচিত!

আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ শিক্ষা হলো আল্লাহর সাথে সততা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বাহিনী তাবুক থেকে ফেরার পর কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে গিয়ে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কারও সাথে কথা বলতাম তাহলে এমন ওজর পেশ করতাম যে তা কবুল করতেই হতো। কারণ কথা বানানো, তর্ক-বিতর্ক এবং ওজর পেশ করার যোগ্যতা আমার যথেষ্টই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মিথ্যা কথা বলে আপনাকে হয়তো সন্তুষ্ট করতে পারব বটে কিন্তু আল্লাহ অতিসত্বরই আমার ব্যাপারে আপনাকে অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আমি

সত্য কথা বলি তাহলে আল্লাহর কাছে আমি উত্তম পরিণামের আশা করতে পারি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোনো ওজর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কোনোই বাহানা নেই। কা'ব ইবনু মালিক চাইলেই মিথ্যা বলে পার পেয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি সৎ ছিলেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"

(সূরাহ তাওবা, ৯:১১৯)

সূরাহ তাওবার এই আয়াতে যা বলা হচ্ছে তা হলো আমাদের বাহ্যিক রূপ আর অন্তরিত রূপ যেন ভিন্ন না হয়। যদি কেউ তাদের অন্তর ছিঁড়েও দেখে সে সেখানে তাই দেখতে পাবে যা সে তার মধ্যে বাহ্যিকভাবে দেখেছে। সত্যবাদীদের অবস্থা হওয়া চাই এমন। আবার, তাদের কারও কারও গোপন ও লুক্কায়িত অবস্থা তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকেও আরও উত্তম। আর সালাফরা বলতেন:

"হে আল্লাহ, আমাদের গোপন অবস্থা, বাহ্যিক অবস্থা থেকে উত্তম করে দিন।
আর আমাদের বাহ্যিক অবস্থা ভালো করে দিন।"

আর ভেতরে বাইরে ভিন্ন রূপ ধারণ করে বেশিদিন মানুষের কাছে ভালো সেজে থাকা যায় না। আল্লাহ অবশ্যই বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তৈরী করে মানুষের ভেতরের পরিস্থিতি প্রকাশ করে দেন। কা'ব ইবনু মালিক এবং অন্য দুই সাহাবি এই ভয়টাই করেছিলেন। তাই তারা আল্লাহর প্রতি সততা দেখাতে পেরেছেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমাও পেয়েছেন।

আল্লাহ আমাদেরকেও আল্লাহর প্রতি সৎ হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমরা যেন সেই দিনটিকে ভয় করতে পারি যেদিন আমরা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবো। আমাদের সমস্ত ভয়, ভালোবাসা যেন থাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য। আল্লাহ আমদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

সত্যিকারের মৃত্যুর আগে এরা প্রতিদিন অনেকবার করে মরে।

ভার্সিটির শেষের দিকে একটা চাকরি করতাম। হলেই থাকতাম তখন। রমযান মাস এলো। সারাদিন অফিস করে অফিসেই ইফতার করতাম। এরপর বাসে করে আবার হলে ফিরতাম। খুব ক্লান্ত লাগত। আমাদের হলের পাশেই একটা নতুন হল হলো সে সময়। হলের মাঝে একটা মাঠের মতো ছিল। সেই মাঠে লম্বা লম্বা সবুজ ঘাস, ঠিক মাঝখানে তিনটা চেয়ার পাতা। সারাদিন শেষে হলে ফিরে এক কাপ কফি নিয়ে সেই সবুজ মাঠে পেতে রাখা চেয়ারে গিয়ে বসতাম। মাগরিবের পরে ঝিরি ঝিরি বাতাস বইত। সেই বাতাসে লম্বা ঘাসগুলো দুলছে, কফিতে চুমুক দিতে দিতে সেই দৃশ্য দেখতাম। এত ভালো লাগত, এত রিল্যাক্সড ফিল করতাম, মনে হতো এই জীবনে আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই।

আমরা জীবনে, প্রতিদিনের এমন ছোট ছোট ভালো লাগার মুহূর্তগুলো এড়িয়ে যাই। বড় বড় সুখের উপলক্ষ খুঁজি। গাড়ি, বাড়ি, অনেক টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবনের ছোট-বড় সবকিছুকে এপ্রেসিয়েট করা উচিত। যার যা কিছু আছে সেখানেই নিজের প্রশান্তির উপলক্ষগুলো খুঁজে নেওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ সবকিছুতে অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করে—অমুকের কী আছে তার কী নেই! মানুষের সাথে তুলনার এই প্রতিযোগিতায় চারপাশে হাজারও আনন্দের উপকরণ তখন আর চোখে পড়ে না। নিজের বউকে ভালো লাগে না, নিজের বাবা-মা কিচ্ছু বোঝে না, নিজের চাকরি, ব্যবসা, নিজের চেহারা-সুরত, নিজের যা কিছু, কিছুই ভালো না। খালি অন্যরাই সুখে আছে, সে একাই দুনিয়ার সবচেয়ে অসুখী মানুষ। সত্যিকারের মৃত্যুর আগে এই মানুষগুলো প্রতিদিন অনেকবার করে মরে!

উপহাসের অট্টহাসি

আপনি নিজে এখনো ঈমানের যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাননি, যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেননি, সেই পরীক্ষা আর কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পতিত কাউকে যদি টালমাটাল অবস্থায় দেখেন, ঈমান নিয়ে হিমশিম খেতে দেখেন, ইস্পাতকঠিন ঈমানে ইস্তিকামাত থাকতে না দেখেন—দয়া করে তাকে নিয়ে উপহাস করবেন না। তার কী করা উচিত ছিল, সে কেন ঈমানের উপর অটল থাকতে পারল না, সে কেন সাহাবিদের মতো আমল করতে পারল না, তার গুনাহ, তার নিফাক্ব দেখিয়ে খোঁচা মারতে যাবেন না।

আল্লাহর একটা সুন্নাহ হলো, যদি এমনটি করে থাকেন, তাহলে আল্লাহও আপনাকে সেই ব্যক্তির মতো ঠিক সেই ঈমানের পরীক্ষায় ফেলবেন, সেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আপনাকেও আল্লাহ নিয়ে যাবেন। খুব তো বড় বড় কথা বলেছিলে, এবার দেখি তুমি নিজে সেই অবস্থায় কেমন ঈমানের তেজ দেখাও—এই চ্যালেঞ্জ আল্লাহ আপনার দিকেও ছুড়ে দেবেন।

উহুদের ময়দানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে অনেক সাহাবি চলে গিয়েছিলেন। মুষ্টিমেয় কিছু সাহাবি সেদিন রাসূলের সাথে টিকে ছিল। এটা ফ্যাক্ট। যদিও আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করেছিলেন।

একই কথা কারও অতীতের পাপের জন্য কাউকে খোঁচা দেওয়া কিংবা উপহাস করার ক্ষেত্রেও—যে পাপ থেকে ইতোমধ্যে সে তাওবা করেছে। ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

> "কোনো বিশ্বাসী বান্দা তার অতীতের যে পাপের জন্য তাওবা করেছে তুমি যদি সেই পাপের জন্য তাকে তিরস্কার করো, জেনে রেখো আল্লাহ তোমাকেও এমন পরিস্থিতিতে ফেলবেন, একদিন তুমিও সেই পাপ করেই ছাড়বে আর লোকেরাও তোমাকে নিয়ে সেভাবে উপহাস করবে।"

তাই কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি না হয়ে ঈমানের তত্ত্ব কপচানো খুব সহজ, ফেসবুকে তো আরও সহজ। কিন্তু সত্যিকারের ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই তত্ত্বকথার কোনো মূল্য নেই।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহর পথে লড়াই করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩: ১৪২)

তিন বন্ধুর মৃত্যুভাবনা

কলেজের তিন বন্ধু, একই সাথে পড়েছি, একই বেঞ্চে বসেছি, একসাথে স্যারের কাছে পড়তে গেছি, আমার মতোই, আমার বয়সেরই তিনজন— মারা গেছে, ভিন্ন ভিন্নভাবে। একজন সুইসাইড করেছে, আমরা তখন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। দ্বিতীয়জন মারা গেছে ব্লাড ক্যান্সারে, তখন আমি ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারে। আর তৃতীয়জন এই কয়দিন আগে মারা গেছে বাইক একসিডেন্টে।

এই তিনটি মৃত্যু নিয়ে প্রায়ই ভাবি, ভয় ঢুকে যায়। যে ছেলেটা সুইসাইড করেছে সে অমুসলিম ছিল। কলেজে উঠেই প্রথম প্রথম যাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল, সে তাদের একজন। প্রায়ই তার সাথে একই বেঞ্চে বসতাম। হঠাৎ একদিন শুনি বাড়ি ফিরেনি, তার কয়দিন পর লাশ পাওয়া যায়, সুইসাইড করেছে। জীবনে প্রথম খুব কাছ থেকে দেখা একজন, যে সুইসাইড করেছে।

দ্বিতীয়জন খুব ভালো ছেলে ছিল, নামাযি ছিল। অমায়িক। ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। খুব মন খারাপ হয়েছিল তার জন্য। আমি তখন ঢাকা ভার্সিটিতে প্রথম বর্ষে, হাওয়ায় ভাসার মতো অবস্থা। সেসময় তার মৃত্যুর খবর কষ্ট দিয়েছিল সত্যি, কিন্তু তাই বলে কিছুই থেমে থাকেনি।

তৃতীয়জন এই কয়দিন আগে বন্ধুর সাথে ঘুরতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বাড়িতে আসেনি, বন্ধুর বাসাতেই ছিল। সেখান থেকে বন্ধু বাইকে করে তার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছিল, বাইক একসিডেন্ট করে, সে মাথায় আঘাত পায়। সপ্তাহ খানেক পর মৃত্যু। আল্লাহর কী কুদর, যে বাইক চালাচ্ছিল তার সেই বন্ধুর কিছুই হয়নি, একসিডেন্ট হওয়ার পর সে দিব্যি উঠে দাঁড়িয়েছে, আর পেছনে বসা আমার বন্ধু মারা গেল। রাজপুত্রের মতো চেহারা, আমরা বলতাম চকলেট বয়। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে, মাত্রই ডাক্তারি পাশ করেছে। বাইকে পেছনে চেপে বসার সময় ঘুণাক্ষরেও কি সে ভেবেছিল, এটাই তার শেষ সময় হতে যাচ্ছে?

এই তিনটা ছেলেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, যারা ছিল আমার মতোই, আমার বয়সেরই। তারা কেউ ভাবেনি তাদের জীবনটা ঐ জায়গায় ঐভাবে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আমরাও ভাবছি না, ভাবছি না যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের জীবনের প্রদীপ নিভে যেতে পারে।

আমার জীবিত বন্ধুদেরকে এই তিন বন্ধুকে নিয়ে প্রায়ই ফেসবুকে আবেগঘন স্ট্যাটাস দিতে দেখি। তাদের কারও কারও জন্য গ্রুপও খোলা হয়েছে। সেখানে প্রায়ই স্মৃতিচারণ দেখি। কিন্তু তারচেয়েও অবাক হয়ে দেখি, যারা আবেগে গদগদ করছে, এই মৃত্যুগুলো তাদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেনি। কারো জীবনেই ফেলে না। বাইক একসিডেন্টে মারা যাওয়া বন্ধুর জানাযায় গিয়েছিলাম। কলেজের অনেক বন্ধুকে দেখলাম সেদিন। সবাই পাঞ্জাবি পরে এসেছে। ইমাম সাহেব জানাযার আগে ছোট্ট বক্তৃতা রাখলেন। অকাল মৃত্যু বলে যে আমরা মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করি সেটা নিয়ে কথা বললেন। অকাল বলে কিছু নেই। আল্লাহর সাথে আমাদের এমন কোনো চুক্তি নেই যে, আমরা ৬০ বছর, ৭০ বছর বাঁচবই।

ভাবনাহীন, নিশ্চিন্ত, দুনিয়া কামাইয়ে ব্যস্ত, দুনিয়া না পাওয়ার পেরেশানিতে বিধ্বস্ত, আরও একটু দুনিয়া কীভাবে কামাই করা যায় সেই প্ল্যানে মগ্ন, এই আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে মৃত্যুগুলো এসে আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে যায়। মানুষের লম্বা লম্বা লাইফ প্ল্যান দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাকাই, মনে হয় এরা বিশ্বাস করে না মৃত্যু বলে একটা বিষয় আছে, আখিরাত বলে কিছু আছে, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর একটা ক্ষণ আছে। অথচ মৃত্যু আসবেই। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবেই। সেদিন যার জান্নাতের ফয়সালা হবে সে-ই সফল, আর যার জাহান্নামের ফয়সালা হবে, সে ব্যর্থ। সিম্পল। অথচ আমাদের কর্মযজ্ঞ দেখে মনে হয় এই হিসেব যেন রকেট সাইন্স। যেন এখানে অনেক কিন্তু আছে, যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না, যেন আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে, যেন এটা বুঝতে গেলে বিরাট পণ্ডিত হতে হবে। অথচ আল্লাহ্ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। আর এই দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সম্বল ছাড়া কিছুই নয়।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৮৫)

কৃতজ্ঞতা STARTS FROM HERE...

স্কুলের পরীক্ষার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। টেনশনে পৃথিবীটা পানসে হয়ে যেত। স্কুলের বেশিরভাগ পরীক্ষাই দিতাম গায়ে জ্বর নিয়ে। এসএসসি পরীক্ষার সময় প্রতিটা পরীক্ষার দিন সকালে নিয়ম করে বমি করতাম। পরীক্ষার সীমাহীন টেনশনে মনেপ্রাণে আল্লাহর কাছে কত করে চাইতাম পরীক্ষাটা যেন ভালো হয়, প্রশ্ন যেন কমন পড়ে! আমার পরীক্ষা ভালো হতো, রেজাল্টও। এরপর স্বার্থপর মন সব ভুলে যেত। আমার মতো হয়তো সব স্টুডেন্টই ভুলে যায় পরীক্ষার জন্য তারা আল্লাহর কাছে কত কাকুতি মিনতি করে। স্কুলের সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে সূরাহ ইউনুসের এই আয়াতটার কথা মনে পড়ে,

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ

"মানুষকে যখন দুঃখ ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ ক্লেশ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলে যায়, মনে হয় যেন তাকে দুঃখ-ক্লেশ স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে কখনো ডাকেইনি।......" (সূরাহ ইউনুস, ১০:১২)

একদিন নামাযে দাঁড়িয়ে পাশের জনের সাথে পা মিলাতে গিয়ে দেখি আমার ডান পায়ের পাশে কোনো পা নেই। অবাক হয়ে দেখি আমার পাশের ভদ্রলোক এক পা নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়েছেন। তার বাম পা কোমর থেকে কাটা। সুবহানআল্লাহ! আল্লাহু আকবার। নামাযে সামনের কাতারে অনেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়ে, তেমন বড় কোনো শারীরিক সমস্যা নেই এমন মানুষও চেয়ারে বসে পড়ে, আর ইনি এক পা নিয়েও দাঁড়িয়ে আছেন। পুরো নামাযে দেখছি কত কষ্ট করে এই মানুষটি নামায পড়ছে। তার তাকওয়া দেখে, এই ভয়ংকর অঙ্গহানির পরও মহান আল্লাহর প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ দেখে মনটা এতটুকু হয়ে গেল।

আরেকদিন ভার্সিটির হলের মসজিদে নামায পড়ছি, দেখি আমার পাশের জন কেমন জানি বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাতার থেকে একরকম বেরিয়ে গিয়ে নামায পড়ছে। খুব বিরক্ত লাগছিল দেখে। কিন্তু সালাম ফিরিয়ে দেখলাম ছেলেটা অন্ধ। কৃতজ্ঞতায় মনটা ছোট হয়ে গেল। এই মানুষগুলো আমাদের মতো সুস্থ নয়। আল্লাহ্ এদেরকে অনেক কিছু দেননি যা আমাদের দিয়েছেন। কারও হাত নেই, পা নেই, কারও চোখ নেই। আল্লাহ্র বিচারকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার মতো অনেক যুক্তি এদের কাছে আছে। কিন্তু অভিযোগ না করে সেই মহান রবের প্রশংসায় সিজদাবনত হতে দেখে নিজের অকৃতজ্ঞতার কথা মনে করে লজ্জায় পড়ে যাই।

আলহামদুলিল্লাহ্ আমার দুইটা পা আছে। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি দুই পায়ে ভর দিয়ে নামাযে দাঁড়াতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্ আমার এক জোড়া জুতা। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি দোকান থেকে পছন্দ করে বেছে বেছে পায়ের মাপে স্যান্ডেল কিনতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি দুই পা ভাঁজ করে আরাম করে বসতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্ আমার দুইটা চোখ আছে। আমার আছে সাতটা রং। আমি কিছু দেখে আবেগে আপ্লূত হতে পারি। কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্।

আপনি কেন মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন না? একবার নিজের শরীরের দিকে তাকান। শরীরের প্রতিটা অঙ্গের কথা চিন্তা করুন। আপনার চোখের পাপড়ি দেখে হয়তো মনে হয় একেবারে নগণ্য একটা জিনিস। শরীরের ওজনের তুলনায় .০০০০০০০০০ সামথিং হবে এর ওজন। এগুলা না থাকলেই কী! কিন্তু কেটে ফেলে দিয়ে দেখুন তো! ঘুমোতে পারবেন না, চোখ বন্ধ করতে পারবেন না। কারণ অতি নগন্য এই জিনিসটা চোখের দুই পাতার মধ্যে জিপারের মতো কাজ করে। চোখ বন্ধ করলে এরা মাঝখানে জিপারের মতো দুই পাতাকে আঁকড়ে ধরে। চিন্তা করুন, মহান আল্লাহ আপাতদৃষ্টিতে অতি নগণ্য মনে হওয়া এই জিনিসটিও আপনার জন্য যত্ন করে বানিয়েছেন।

দুইটা সুস্থ সবল হাত, হাতের দশটা আঙ্গুলই ঠিক। কিন্তু ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলটা স্কচ টেপ দিয়ে আটকে রাখুন তো! শার্টের বোতামটাও লাগাতে পারবেন না। অন্য কাউকে ডাকতে হবে বোতাম লাগানোর জন্য। কৃতজ্ঞতা starts from here, এখান থেকেই কৃতজ্ঞতায় আপনার বুকটা ভরে যাওয়া উচিত। সিজদায় পড়ে চোখের পানি ছেড়ে দেওয়া উচিত।

আলহামদুলিল্লাহ্ শব্দের অর্থ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দ্বীন ইসলামের খুঁটি শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্য যে কয়টা বিষয় অত্যাবশ্যকীয় তার একটি

কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা ছাড়া আপনি একজন ঈমানদার হতে পারবেন না, মুমিন হতে পারবেন না। কখনোই না। কেন পারবেন না তা একটা ছোট্ট সিকুয়েন্স দিয়ে বলি। অন্তরের কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে আনুগত্য আসে, আর আনুগত্য থেকে আসে সমর্পণ। এটাই তো ইসলাম! বান্দা তার রবের প্রতি অনুগত থেকে নিজের ইচ্ছাকে তার নিকট সমর্পণ করবে। একারণেই একজন মুসলিমকে কৃতজ্ঞ হতে হয়। একজন মুমিনকে কৃতজ্ঞ হতে হয়। জান্নাতের স্বপ্ন দেখা প্রতিটি ঈমানদারকে কৃতজ্ঞ হতে হয় মহান আল্লাহর কাছে।

একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দেখা গেল তিনি একবার হাসছেন, একবার কাঁদছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কেন তিনি এমন করছেন। তিনি বললেন, আমি জাহেলি যুগে একটি দিনের কথা ভেবে হাসছি। সেদিন আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মূর্তিপূজা করার শখ জাগল। কিন্তু আমার মনে পড়ল যে আমি আমার মূর্তিটি ফেলে এসেছি। তাই আমি উপাসনার অন্য একটি উপায় বের করার চেষ্টা করছিলাম। তখন আমার সাথে ছিল কিছু খেজুর। আমি সেই খেজুরগুলো দিয়ে একটা মূর্তি বানালাম এবং সেই মূর্তির পূজা করলাম। আবার সেই রাতেই আমার অনেক খিদে পায়। তখন আমি খেজুরের তৈরি মূর্তিটি খেয়ে ফেলি! সেই অর্থহীন মূর্তি আর উপাসনার মূর্তি নিজেই খেয়ে ফেলার কথা মনে করে উমরের হাসি পেয়ে গেল। আর এরকম এক জিল্লতির জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ তাকে ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন, ঈমান দান করেছেন, একথা মনে করে তিনি কেঁদে ফেললেন।

আল্লাহ আপনাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" এর অনুসারী বানিয়েছেন। শুধু, শুধুমাত্র দয়া করে। যে মানুষটিকে আল্লাহ ঈমান দিয়েছেন, তাঁর রবকে চেনার তাওফিক দিয়েছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারার সুযোগ দিয়েছেন, প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করার সামর্থ্য দিয়েছেন, সে মানুষটি কি জানে সে কত ভাগ্যবান? আল্লাহ কত কত দুর্ভাগা মানুষের মাঝখান থেকে এই মানুষটিকে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাদের সাথে শামিল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌। আপনি যে ভাগ্যবান এটা বুঝতে পারাটাও একটা রহমত। সেই রহমতের জন্যও আপনার বলা উচিত আলহামদুলিল্লাহ।

আজ আমরা তিনবেলা ভালো খেতে না পেরে আক্ষেপ করি আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ তাঁর সাহাবিরা পেটে পাথর বেঁধে থাকতেন। আপনার খুব দামি ব্র্যান্ডের জুতা নেই কিন্তু আপনার জুতা পরার দুইটা পা আছে—কারো হয়তো সেটাও নেই। আপনার খুব ভালো, দামি কাপড় নেই কিন্তু স্মরণ করুন আবু

যর গিফারির মত সাহাবি, হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো বীর শহীদদের কবরস্থ করার সময় এক টুকরো কাফনের কাপড়ও ছিল না! আপনার হয়তো খুব সুন্দর একটা ফ্ল্যাট বাড়ি নেই কিন্তু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো মানুষও মাঝে মাঝে শুধু মাটির উপর শুতেন। আর এই দেখে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সম্বোধন করেন, "ইয়া আবা তুরাব—ওহে মাটির অধিবাসী প্রাকৃতজন।"

খুব সুন্দরী বউয়ের শখ ছিল? আপনার বউটা হয়তো অত সুন্দরী নয়, কিন্তু হয়তো তার দ্বীন অন্য অনেকের চেয়ে উঁচুতে। সে পর্দা করে, আল্লাহর দ্বীন পালন করে, আপনাকে আল্লাহর জন্য অনেক অনেক ভালোবাসে। ফযরের সময় আপনাকে ডেকে দেয়। আপনার সন্তানকে সে দ্বীন শিক্ষা দেয়—হা করে বসে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখে না! সংসারের শত অভাব অনটনের সময়ও সে ধৈর্য হারায় না। দামি গয়নাগাটির বায়না ধরে না। সে জান্নাতের স্বপ্ন দেখে আর আপনাকেও স্বপ্ন দেখায়। কত বড় রহমত আপনার প্রতি! কখনো এই বিশাল রহমতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছেন?

আমার কাজিনের একটা বাচ্চা হয়েছে সদ্য! কী যে আদর লাগে মাশাআল্লাহ! ছোট বাচ্চা এই প্রশ্রাব করে, এই পায়খানা করে, আর তার মা তা প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করে। এতে যেন এক ধরনের আনন্দ তার। আপনারও হয়তো ছোট বাচ্চা আছে, আপনার স্ত্রীও এক বুক মমতা নিয়ে বাচ্চার পায়খানা-প্রশ্রাব পরিষ্কার করতে পারে, আপনি বাচ্চার জন্য খেলনা কিনে কিনে ঘর ভর্তি করে ফেলতে পারেন, তার তুলতুলে গালে গাল ঘষে আদর করতে পারেন, অসুস্থ হলে টেনশনে ছুটাছুটি করতে পারেন, বারান্দায় হেঁটে হেঁটে গুন গুন করে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ্ আপনার আশেপাশেই অনেক মানুষ দেখতে পাবেন আল্লাহ এদের কোনো সন্তান দেননি। আপনাকে দিয়েছেন—শুধুমাত্র দয়া করে দিয়েছেন। না দিলে কী করতে পারতেন? কিছুই না। কৃতজ্ঞ হয়েছেন মহান আল্লাহর কাছে? চোখের পানি ফেলেছেন কোনোদিন?

এদেশের অবস্থা খুব খারাপ? এদেশে কেন জন্ম নিলেন? আক্ষেপ হয় কি? সোমালিয়ার মানুষ খেতে না পেয়ে মারা যায়। ফিলিস্তিনের মানুষগুলোর কাছে এতটুকুও নিশ্চয়তা নেই যে তাদের স্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়েরা সুস্থ অবস্থায় ঘরে ফিরবে কি না! আফগানিস্তানের মানুষ বছরের পর বছর আমেরিকানদের বন্দুকের তলায় জীবন পার করে দিচ্ছে। ইরাকের মা বোনদের ঘর থেকে ধরে নিয়ে পালাক্রমে গণধর্ষণ করা হয়। চীনের উইঘুর মুসলিমদের রাষ্ট্রীয়ভাবে হত্যা,

নির্যাতন, ধর্ষণ চলছে। রোহিঙ্গা মায়ের সামনে তার সন্তানদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সন্তান, স্বামীর সামনে মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়েছে। আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ্। তিন বেলা খেয়ে এখনো পর্যন্ত আরাম করে ঘুমাতে পারেন।

ভার্সিটির হলে উঠে গণরুমে থাকতাম। কী কষ্ট! ঘুমানোর কষ্ট। ভালো করে পিঠটা রাখারও জায়গা নেই। তারপর ঘুম না এলে রাত্রিবেলা রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে ফুতপাতে ঘুমিয়ে থাকা মানুষ দেখে ভাবতাম, কত ভালোই না আছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

আপনি যে মুসলিম বিশ্বাস করেন মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব। যে বিশ্বাস করেন সবকিছুর ফয়সালাদানকারী মহান আল্লাহ—আপনি তাঁর উপর আস্থা রাখবেন, বিপদে ধৈর্যধারণ করবেন। ভালো কিছু না পেলে ধরে নেবেন এর চেয়ে ভালো কিছুর জন্যই আল্লাহ আপনাকে আখিরাতে উপস্থিত করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছেন। যার পরীক্ষা যত কঠিন তার পুরস্কারও তত বেশি, তত উত্তম। মহান রবের দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন, আখিরাতের দিকেই আমাদের দৃষ্টি। অনন্ত জান্নাতের আশা বুকে লালন করেই আমাদের বেঁচে থাকা। থাকুক না এপারের অপূর্ণতা, ব্যর্থতা, আক্ষেপ—ওপারে আল্লাহ্র কাছে চেয়ে নেব।

আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন বিশিষ্ট সাহাবি। একদিন এক ব্যক্তি আবু যরের নিকট এলো। সে তাঁর ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল। ঘরে বলতে গেলে কিছুই নেই। লোকটি আবু যরকে জিজ্ঞেস করল,

—"আবু যর, আপনার সামানপত্র কোথায়?"

আবু যর উত্তর দিলেন—"আখিরাতে আমার একটি বাড়ি আছে। আমার সব উৎকৃষ্ট সামগ্রী সেখানেই পাঠিয়ে দিই।"

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা ভালোই তো আছি, সুখেই আছি। অন্য অনেকের চেয়ে আল্লাহ অনেক ভালো রেখেছেন। অনেকের মধ্য থেকে আমাদের এই বুঝ দিয়েছেন যে, আমরা মুসলিমরা আখিরাতের জন্য বাঁচি। আলহামদুলিল্লাহ্।

সেমিস্টারের সিজিপিএ খুব একটা ভালো না? আল্লাহ আপনার জন্য হয়তো এটাই চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ্। কী খাব, কী পরব, কী চাকরি করব, কত বেতন পাব এসব নিয়ে টেনশন করে মরছেন, অথচ রিযিকের ফয়সালা হয় আসমানে, আমাদের জন্মেরও আগে। এটা নিয়ে টেনশন করে শেষে অকৃতজ্ঞ হওয়ার ফায়দা

কী? আল্লাহ যদি কিছু নাই দেন তারপরও আলহামদুলিল্লাহ্, আখিরাতে চেয়ে নেবেন। সবাই আপনাকে ভালোবাসবে না। কেউ ঘৃণা করবে, কেউ পাত্তা দেবে না, কেউ অপমান করবে, কেউ ভুল বুঝবে। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করছেন কিন্তু আমাদের ভালোবাসা হওয়া চাই শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই।

জীবন তো এখানেই শেষ নয়। আকাশের ওপারে একটি বাড়ি আছে। লাল নীল হীরার বাড়ি। আকাশের ওপারে আমাদের সাথী আছে, জানতেও চাই না সে কেমন, আল্লাহ ভালো জানেন। আকাশের ওপারে আমাদের রব আছেন। তার জন্যই আমাদের এই অশ্রুসিক্ত অপেক্ষা। আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ for everything...

এই দ্বীন পালন যেন উত্তপ্ত মরুভূমিতে একাকি পথ চলা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ছুটে চলা, থমকে যাওয়া, মাটিতে গড়িয়ে পড়া, শীতল পানিতে তৃষ্ণা মেটানো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গাছের ছায়ায়। উস্কোখুস্ক চুল, ধুলোমাখা পা, জরাজীর্ণ জামা—অবশেষে এই দৌড় প্রতিযোগিতার শেষ প্রান্তে পৌঁছা। যার পরের কদম থেকেই আল্লাহ আযযা ওয়া যাল আমাদের দিয়েছেন অনন্ত সুখের প্রতিশ্রুতি। তাই সেই জীবনের স্বপ্ন অন্তরে বুনে নিন, যে জীবন আল্লাহর জন্য বাঁচে। যে জীবন ঘাস ফড়িঙ কিংবা জোনাকি পোকার মতো বন্দি নয়। যে জীবন অনেকের ভিড়ে পরাজিত, অধঃপতিত মানসিকতার নয়। যে জীবন এক বিঘত বুকে বিশাল আকাশ ধারণ করে বাঁচে। যেদিন বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে যাবে শত্রুর আঘাত, মাটিতে গড়িয়ে পড়বে প্রথম রক্তবিন্দু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখিয়ে দেবেন জান্নাতে আমাদের ঘর, সেদিন—সেদিন হয়তো আকাশের ওপারের ঐ জীবনের জন্য কিছু সঞ্চয় হলো।